Cadence

ANNUAL MAGAZINE

2021

Bangladesh University of Professionals (BUP)

Cadence

ANNUAL MAGAZINE

ANNUAL MAGAZINE 2021

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Mirpur Cantonment, Dhaka - 1216

www.bup.edu.bd

Cadence

বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০২১

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	: চতুর্থ
প্রকাশক	: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	: **মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান**, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
প্রকাশনায়	: পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (পিআরআইঅ্যান্ডপি), বিইউপি। ফোন: Phone: +৮৮-০২-৮০০০৩৬৮, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮০০০৪৪৩ E-mail: info@bup.edu.bd, Website: www.bup.edu.bd
আলোকচিত্র	: অডিও-ভিডিও ম্যান মোঃ বাপ্পি মিয়া (পিআরআইঅ্যান্ডপি)
গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা	: মাহ্‌মুদুর রহমান (পিআরআইঅ্যান্ডপি)
মুদ্রণ	: ইছামতি প্রিন্টার্স মহাখালি, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১২

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় দাড়িয়ে সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও উন্নত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে বিইউপি এগিয়ে চলছে। আমাদের এ পথচলাকে অর্থবহ করে তুলতে মেধার পাশাপাশি মানবিক গুনাবলীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বিইউপির সকল সদস্যের অংশগ্রহনে মেধা ও মননের সেতুবন্ধন হয়ে কাজ করে 'Cadence'.

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' এ লেখা প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তাদের প্রতিভা বিকশিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এসব লেখনি লেখকদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সম্ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়ে মননশীলতা তৈরিতে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

চলমান প্রতিকূলতার মাঝেও যথাসময়ে বার্ষিক ম্যাগাজিনে 'Cadence' প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশেষে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় যাদের অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠা জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। সর্বোপরি বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' এর উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

Cadence এর চতুর্থ প্রকাশনায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন। নবাগত উপ-উপাচার্য হিসেবে বিইউপির এই ভিন্নধারার উদ্যোগে আমি সত্যিই অভিভূত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত পরিবেশে জীবনের স্বপ্নপূরণে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা যখন গঠনমূলক লেখালেখিতে আত্মনিবেদন করে তখন তা প্রকৃতই তাদের নিজস্ব আত্মোপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায় – অমিত সম্ভাবনার প্রত্যাশায় সামনে ছুটে চলার গতিতে যোগ করে অনুপ্রেরণার বিদ্যুৎস্পর্শ। আর এই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদাতা শিক্ষকেরা যখন যুক্ত হয় পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত জ্ঞানবিতরণে তখন তা হয়ে ওঠে এক জ্ঞানানুসন্ধানী দলের যৌথ জয়গাঁথা। আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়ায় যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জয়যাত্রায় গতি সঞ্চারে নিবেদিতপ্রাণে যোগ দিয়েছেন সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

যদিও কঠিন তবুও নৈমিত্তিক ব্যস্ততার ফাঁকে সামান্য সময় বের করে নতুন কিছু রচনার মধ্যে নিহিত রয়েছে সৃষ্টির আনন্দ। আসলে Creative writing বা সৃষ্টিশীল লেখনীর চর্চার মাধ্যমেই কেবল নবধারার অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভব। Cadence এর প্রকাশনা এই মহতী চর্চার প্রতিফলন – এক অমিত সম্ভাবনার প্রাণধারা।

আমি এই প্রাণধারার জয়যাত্রা কামনা করছি।

M Hossain

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

প্রধান সমন্বয়কারীর বাণী

প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বাংলা এবং বাঙালীর রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে সাহিত্য সুষমা ছড়িয়ে দিতে ২০১৮ সাল থেকে বিইউপি ম্যাগাজিন 'Cadence' এর প্রকাশনা শুরু হয়। ইতোমধ্যে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রাণাধার। ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক রচনা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন রচনাসমূহের সংকলন 'Cadence' শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থবারের মত বিইউপির বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' প্রকাশ করার বিষয়টি আমাদের সাহিত্য চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, বিইউপি ম্যাগাজিন প্রকাশনার এই মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এয়ার কমডোর এ কে এম মনিরুল বাহার, বিএসপি, এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

নিয়মিত সাহিত্য চর্চা মানব মনের ভাবনাগুলোকে প্রস্ফুটিত করতঃ সাহিত্য ও ঐতিহ্য লালনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তারই অংশ হিসেবে চতুর্থবারের মত বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করার বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও উৎসাহের অভিব্যক্তি এই ম্যাগাজিন 'Cadence'।

চলমান করোনা মহামারিতেও বিইউপি স্বীয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে যা সত্যিই অনন্য। বার্ষিক এই প্রকাশনা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর উদযাপনকে স্বরণীয় রাখতে ভূমিকা রাখবে।

এ ম্যাগাজিনটি বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের লেখনির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। যা ভবিষ্যতে মননশীল নাগরিক তৈরীতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে, সম্পাদনা পর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এছাড়া যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম জিয়াউল হক, বিইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এটিসি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম জিয়াউল হক, বিইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এটিসি

লেঃ কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ)
পিএসসি

কমান্ডার আবুল খায়ের মোহাম্মদ জাকারিয়া,
(ট্যাজ), পিএসসি, বিএন

মেজর মোঃ ইউসুফ শরীফ, সিগন্যালস

সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহমিদা হক

সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ
শওকত ওসমান

অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সহকারী রেজিস্ট্রার ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ওসমান গণি

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

সূচিপত্র

বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২১

ক্র/নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০১	Bangabandhu: Visionary and Charismatic Leadership	Dr. Syed Anwar Husain	১
০২	একটা ৫০০ টাকার নোট	জান্নাতুল ফেরদৌস	১০
০৩	Ethics and Aesthetics in University Education: BUP's Axiological Approach	Prof Maj Gen (Retd) Mohammad Quamruzzaman	১৩
০৪	রাসেল আমার নাম	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ সালাহউদ্দীন	১৬
০৫	মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান	তাহমিনা সুলতানা	১৮
০৬	Nikola Tesla: A Crazy Scientist	Maliha Tabassum	২২
০৭	ক্ষুধা	নুসরাত জাহান	২৬
০৮	ইস্টিশন	মোঃ ইশতিয়াক ইউনুছ	২৮
০৯	আদর্শে বঙ্গবন্ধু	আলী মর্তুজা	৩০
১০	আমি স্বপ্ন বলছি	মোছাঃ সানজানা হাসান	৩১
১১	Addiction to Social Media: A Crux That We Cannot Look Beyond Anymore	Sanjoy Basak Partha	৩২
১২	গাথা সমাচার	কাজী সিয়াম	৩৫
১৩	Comprehension	Mirana Tahsin	৩৬
১৪	সবার জন্যে না	এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন	৩৭
১৫	She will Read Me Today	Raufur Rahman	৩৮
১৬	'সাধারণ' আর 'অসাধারণ'	এয়ার কমডোর মুহাম্মদ বেলাল	৩৯
১৭	A Gift of Destiny	Md Shariful Hasan Khan,	৪৩
১৮	জীবন নাটিকার রঙ্গমঞ্চ	ফাহমিন চৌধুরী তাজিম	৪৪
১৯	Air Strike by Kilo Flight: A Turning Point of Liberation War	Group Captain A K M Ziaul Haque, BUP, afwc, psc	৪৬
২০	মহাযাত্রা বৃত্তান্ত	আবীর মোহাঃ শাকিব শাহীনী	৪৯
২১	Soliloquy of a Chess Pawn	Azharul Islam	৫১
২২	কল্পনায় হুমায়ূন আহমেদ	মো. মুঈন রিদওয়ান চিশতী	৫৩
২৩	অন্তপারের ভাবনা	আব্দুল্লাহ আল মাদানী	৫৪
২৪	Rage	Sumaiya Mehreen Meem	৫৬
২৫	Close the doors	Tanjila Akter Mim	৫৮
২৬	ভুল সাঁতারে জলাতঙ্ক	সুরভী আক্তার	৫৯
২৭	লোকসংস্কৃতি ও কতিপয় লোকচিত্রকলা: বৃহত্তর খুলনা প্রসঙ্গ	আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী (তমাল)	৬১
২৮	বাক্যহীন নিস্তব্ধতা	ফাহমিদা আহমেদ	৬৫
২৯	Struggles of Being an Ambivert During Quarantine	Anika Meher Amin	৬৬
৩০	হে প্রজন্ম	মোঃ মাহামুদুন নবী রুপক	৬৮
৩১	Tale of BUP BNCC PLATOON	Md. Fahim Imtiaz	৭১
৩২	অনিঃশেষ	মাজহারুল ইসলাম তুহিন	৭৪
৩৩	Agony!	Md. Arif Hossain	৭৫

সূচিপত্র

বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২১

ক্র/নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩৪	কান নিয়েছে চিলে	শাশীশ শামী কামাল	৭৬
৩৫	Hope	Sumaiya Tarannum Sujana	৭৮
৩৬	সুখের সন্ধানে...	ফাতেমা তুজ জোহরা	৭৯
৩৭	স্বাধীনতা	বনি আমিন	৮১
৩৮	সোশ্যাল মিডিয়া: যেসব ব্যাপার না জানলেই নয়!	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	৮২
৩৯	বিজয়ের প্রভাতে	নুরুজ্জামান শিশির	৮৪
৪০	অর্ধশতকের বাংলাদেশ	এস এম নেয়ামতউল্লাহ	৮৫
৪১	The Wicked Hand	Nashiba Samarat	৮৭
৪২	জাপান থেকে শেখা	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৯০
৪৩	কোয়ারেন্টাইনের খপ্পরে মহামনীষীগণ	ড. মো: মোহসীন রেজা	৯২
৪৪	Lost Soul	Priyanka Kundu	৯৫
৪৫	আমার দেখা জানজিবার	মেজর মোঃ এরশাদ মনসুর, ইবি	৯৬
৪৬	স্বপ্ন	মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর	৯৮
৪৭	Innovation in Public Administration: An Important Tool for Simplifying Public Service Delivery in Bangladesh	Helal Uddin	৯৯
৪৮	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	ওমর ফারুক	১০২
৪৯	মঙ্গল অভিযান	ফারদিন ইসলাম	১০৩
৫০	একা আমি	মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ	১০৬
৫১	Fostering Leadership through Critical Thinking	Rahat Ahmed Shimanto	১০৭
৫২	শ্রমিকের চোখে ইতিহাস	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	১১০
৫৩	রক্তের বন্ধনে গড়ি নতুন সমাজ	তোফায়েল আহমেদ	১১২
৫৪	সুখী কে?	মেজর মোঃ ইউসুফ শরীফ, সিগন্যালস্	১১৯
৫৫	Technical Education in Bangladesh: An Avenue to be benefited from Demographic Dividend	Maj Md Sabir Ahmed, psc (R)	১২০

Bangabandhu: Visionary and Charismatic Leadership

Dr. Syed Anwar Husaain
Bangabandhu Chair Professor

Bangabandhu's leadership, enchanting as it was, merits conceptual analysis from the theoretical perspective of leadership. Leadership, as generally understood, is the ability of an individual or individuals to influence and guide followers. Great leaders know how to both inspire people and get followers to complete the task that achieves the leader's goal. An oft–quoted definition of leadership by the former U.S. President Dwight D. Eisenhower sounds relevant in such a context. He said, "Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it." But a more comprehensive definition of leadership covering the leader – follower nexus is given by Gary Wills as he says, "Leaders have a vision. Followers respond to it. Leaders organize a plan. Followers get sorted out to fit the plan. Leaders have willpower. Followers let that will replace their own. . . the leader is one who mobilizes others toward a goal shared by a leader and followers."[1] A generalized definition highlighting the entire gamut of leadership phenomenon is contained in the ancient Chinese tradition; and as per which leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and discipline. . . reliance on intelligence alone results in rebelliousness. Exercise of humaneness alone results in weakness. Fixation on trust results in folly. Dependence on the strength of courage results in violence. Excessive discipline and sternness in command result in cruelty. When one has all five virtues together, each appropriate to its function, then one can be a leader.[2]

Taken all these postulations together, and applied to Bangabandhu, the resultant conclusion is ineluctably positive. In this exercise, however, visionariness and charisma, as the two attributes of Bangabandhu leadership, are analysed in an applied context.

Divided into three core sections, the opening one concentrates on piecing together theoretical postulations *vis-à-vis* visionariness and charisma. The two sections thereafter give empirical discussions on Bangabandhu's visionariness and charisma.

I

Visionary and Charismatic Leadership Explained

Visionary

Defined broadly, a visionary is one who can envision the future. A visionary is thus a person with a

clear, distinctive, and specific (in some details) vision of the future. To be more specific, a visionary leader creates a vision around solving a problem in an innovative way and then uses that vision to connect to the hearts of people in a way that inspires them to action.

As many as 15 traits have been suggested for a visionary leader;3 and these are: 1. Detail oriented and aware; 2. Innovative; 3. Conviction; 4. Determined; 5. Persistent; 6. Excellent communicator; 7. Strategic; 8. Dedicated; 9. Humble; 10. Empowering (team work); 11. Service oriented; 12. Growth oriented; 13. Ethical; 14. Caring; and 15. Inspiring.

Charisma

Charisma is a concept of leadership developed by the German sociologist Max Weber.[4] Charismatic leadership is basically the method of encouraging particular behaviours in others by way of eloquent communication, persuasion and force of personality. Charismatic leaders motivate followers to get things done. This is accomplished by conjuring up eagerness in others to achieve a stated goal or vision. Charismatic leaders are found to be essentially good communicators. Such leaders are very eloquent verbally and they have ability to communicate with the people and lead on a profound emotional level. The communication level is successful as this type of leaders articulate a captivating or compelling vision. They have the capacity to evoke strong emotions in their followers.

In 1988, Jay Conger and Rabindra Kanungo published Charismatic Leadership, which outlined the key characteristics of a charismatic leader. The findings have been repeatedly shown to be accurate in a number of other similar studies, such as Robert House and Jane Howell's 1992 paper "Personality and Charismatic Leadership."[5]

The qualities of a charismatic leader may be the following: 1. Visionary; 2. Articulate; 3. Sensitive; 4. Risk – taker; 5. Creative; 6. Self – confidence; and 7. Positive body language.

As we proceed on to analyse Bangabandhu's leadership typology we find that he fits in well with the definitions and characteristics outlined above.

II

Bangabandhu: the Visionary

That Bangabandhu was a leader with a clear vision is borne out by the historical facts from 1947 through 1971; a period coinciding with the painful process of the emergence of Bangladesh.

In August 1947, immediately after the birth of Pakistan, Bangabandhu had a meeting with some associates in his room no 24 at the Baker hostel. He shared two specific points in that meeting. First, he was the first to be disillusioned with the way Pakistan was shaped, and having been so, mentioned that this Pakistan would not help the Bangali people, also that a movement had to be started anew after getting back to Dhaka for redressing the woes of these people. Second, in his mundane language, he categorically said that the Bangali people would not be able to stay long with the non

– Bangalis. With hindsight, it may be said that both the comments were prophetic in foreshadowing the birth of Bangladesh through a relentless struggle. In 1972, Anyada Shankar Roy, the famous Indian litterateur, a asked Bangabandhu as to when he had conceived the idea of independent Bangladesh; Bangabandhu rightly replied that it was in 1947. Moreover, at about the same time he, in the editorial office of the pro-Muslim periodical Saptahik Millat (Weekly Millat), made a statement to the effect that Bangla should be the state language of Pakistan as this language was used to be spoken by the majority citizens of the state. Thus, by saying so, he also foreshadowed the Language Movement (1947-1952); this movement was the earliest attempt at autonomy assertion by the Bangali people. This was also a movement in which Bangabandhu, although then incarcerated, had a decisive behind-the-scene role.

In 1961, although the General Secretary of the Awami League (AL), a party for safeguarding Bangali interests, Bangabandhu had his personal project of Purba Vanga Mukti Front for emancipating his people. It is on record that he had leaflets printed under this title at his own cost and he himself distributed these leaflets riding his own bike. The subsequent history bears testimony to his success in freeing Bangalis from Pakistani internal colonialism.

Sometime in 1961, Tofazzal Hossain Manik Mia, the editor of The Daily Ittefaq, was instrumental in arranging a secret meeting for Bangabandhu with two left leaders – comrades Moni Singh and Khoka Roy. Bangabandhu, in that meeting, argued that nothing short of independence would help the Bangalis. The two comrades, while agreeing with the imperative, cautioned Bangabandhu not to speak of independence in public as that would land him in trouble, because there had been the military rule of Ayub Khan. Bangabandhu rounded off the meeting by saying that he would heed the caution of the comrades, but would always remain unflinching to his goal of independence.

The 1966 Six Point formula was, indeed, a cumulative expression of Bangabandhu, the visionary. Rightly dubbed the liberation document of the Bangalis, it encapsulated their hopes and aspirations under the most adverse of the circumstances.

One day in 1968, Bangabandhu along with accuseds of the Agartala Conspiracy Case were being driven to the secret military tribunal. Col.(retd.) Shawkat Ali, himself an accused, asked Bangabandhu as to what future awaited them. In reply, Bangabandhu gave him almost a graphic picture of the future as envisaged by him: the trial would end soon because of a public outburst; there would be election with the AL winning a thumping victory; power would not be handed to them with consequences to follow.[6] This was exactly what happened in the subsequent days. That Bangabandhu was not an astrologer is certain; but this incident, along with many others, confirm that he was endowed with the quality of extra – sensory perception (ESP).[7]

On 5 December 1969, at a public discussion arranged on the occasion of the sixth death anniversary of Suhrawardy, Bangabandhu declared, on behalf of the people, that the province of East Pakistan be renamed as 'Bangladesh'.

The proposal was greeted with cheers by the crowd present on the occasion. On the following day, Maulana Bhasani and Ataur Rahman Khan, the two elderly Bangali politicians, endorsed the proposal in separate press statements. That a leader could rename his homeland, and which was readily accepted by the people demonstrated the extent of his visionary ability.

Yahya Khan, the military dictator, who had replaced Ayub Khan, another military dictator, on 25 March 1969, declared early in 1970 the schedule of general elections by the end of the year. Immediately after this welcome declaration, he shared a disquieting feeler through issuing the Legal Framework Order (LFO). By the provisions 25 and 27, any attempt to change the constitutional status quo was not to be mulled by the establishment. It may be mentioned that the AL had been campaigning for constitutional changes as per the Six and Eleven points. Under the circumstances, it became evident that the LFO had the ulterior motive to thwart such AL move. Against such a backdrop, many in the AL higher echelons became diffident about participating in the forthcoming elections. But, Bangabandhu appeared as resolute and determined as always and blurted out, "My goal is independence of Bangladesh. I will tear the LFO into shreds once the election is over."[8]

Again, doubts were raised about the elections in the wake of severe damage to life and property wrought by a tornado in the coastal areas of the then East Pakistan. As the central government appeared quite oblivous to the plight of the tornado-hit people, many politicians doubted the desirability of elections in such circumstances. Maulana Bhasani's National Awami Party (NAP) boycotted the elections. There was dithering in the AL as well; Bangabandhu remained firm in his decision to participate in the elections. Subsequent history proved him right in his farsightedness.

Immediately before the elections, Bangabandhu faced a question from a foreign journalist as to how many seats the AL would get at the center. Giving a prompt reply, Bangabandhu said 167 out of the allotted 169 seats. He also mentioned that of the two seats, one would go to the independent candidate Raja Tridiv Roy from the Chittagong Hill Tracts (CHT); while the other one to Nurul Amin from Mymensingh. Despite the Pakistan military intelligence report that the AL seats would not be more than 60, the result was exactly what had been predicted by Bangabandhu. Once again, Bangabandhu proved his sagacity.

The vision of a free Bangladesh that Bangabandhu had since 1947, came out in a cumulative shape in his path – breaking and defining speech of 7 March. It was more than a speech; it was an oration, and the speaker an orator. Although a short and an unwritten one, this was the best that Bangabandhu had ever delivered both in oral and body languages. His words changed brains of the ones who listened to him; and a confused Bangali nation had a clear vision before them as Bangabandhu roared in his thunderous voice: "The struggle this time is for our emancipation; the struggle this time is for independence." It was thus a vision of independence coupled with emancipation, to be achieved through a guerilla – type people's war. Thus this oration remains recorded in history as the one which had transformed a peoplecentric leader into a sagacious statesman.

After having spent 290 days in the Pakistani jail, Bangabandhu was freed to travel to London on 8 January 1972, where, on the same day, he addressed a press conference at the Claridges Hotel. While speaking, Bangabandhu was accosted by a foreign journalist saying, "what would you do getting back to Bangladesh? The country is totally war – devasted." Bangabandhu's reply was as visionary as ever: "If I have my people and the land, we will rise again." Indeed, he had both, and he envisaged a phoenix – like resurrection of Bangladesh, a vision he sought to actualize during the short time he had been at the helm in the totally devasted Bangladesh.

On 10 January 1972, Bangabandhu's home-coming address was delivered unwritten and impromptu at the same Race Course. In Bangabandhu's words, Bangladesh was envisioned as an "ideal state, the basis of which will not be religion. The bases of which will be democracy, secularism and socialism (subsequently, at the time of writing the constitution, nationalism was added as the fourth fundamental principle of the state). The new state was envisioned as an aboded wherein the people would live in a free environment; they would get food and clothes, and unemployed youths would get jobs. Such a state was later dubbed Sonar Bangla (Golden Bengal), which was, in fact, a visionary state with a promise for people's better future.

Between 10 January 1972 and 15 August 1975, Bangabandhu had, in total, 1,314 days to redeem the visionary promises he had made. This tumultuous period was divided into two phases: upto January 1975; and since 25 January through 15 August 1975. During the first phase, "the bottomless basket," as per Dr Henry Kissinger's prognostication, was fitted with a substantial bottom, and the basket itself was filled to a large extent. But the U.S. made famine of 1974, and the machinations of the political detractors had the going get tough for the beleaguered leader Bangabandhu. Under the circumstances, a short-term solution called Bangladesh Krishak Sramik Awami League (BKSAL) was launched as a common national platform, not certainly as a single party. Were it successful, the system would have revolutionized the society, economy, polity and bureaucracy. During the 233 days the system was in operation, all the indications showed upward trend. The BKSAL was, in essence, a long shot in the right direction, and with a clear vision. But it had a premature death like its author's.

III

Bangabandhu: the Charismatic

In 1966, shortly after the Six-Point plan was made public, Sirajul Alam Khan, a front-ranking Chhatra League leader, and also the head of the Nucleus, a youth front clandestinely working for independence, made a comment bearing on the charisma of Bangabandhu. He said, "Independence has to be achieved under Sheikh Mujib's [he was not yet Bangabandhu] leadership, for people listen to him." Indeed, this was a commentary on how Bangabandhu could captivate and enthrall his audience through his oratorical skill – a sure charismatic trait.

This charisma was not a sudden and overnight phenomenon, it had a long gestation period through the volatile political career of Bangabandhu. He earned this charisma through his life-long devotion to people's cause. In 1954, for example, while campaigning as the United Front candidate for the

upcoming provincial assembly election, Bangabandhu was blessed by an elderly lady of the locality with the words: "The prayers of the poor will be with you." A young man of 34, Bangabandhu was moved and subsequently wrote in his memoirs, "when I left her hut my eyes were moist with tears. On that day, I promised myself that I would do nothing to betray my people."[9]

How much of Bangabandhu's charisma impacted on the youth psyche was demonstrated after Bangabandhu, along with 34 others, were jailed under the Agartala Conspiracy Case. In view of a ban on open politics, political parties were barred from any demonstration; as such, the youths were found on the streets in thousands protesting against the conspiratorial case and chanting the slogan: "We will break the lock of jail, and free Sheikh Mujib." As the subsequent events showed, the enormous strength of the youth force compelled the establishment to withdraw the case and free Sheikh Mujib. The weight of the youth force was further felt as power changed hands from Ayub Khan to Yahya Khan; although, in reality, it was from martial law to martial law.

A new height of Sheikh Mujib's charisma was reached on 23 February 1969, the day after his release from jail, when a mammoth civic reception at the Race Course, gave him the honorific "Bangabandhu" (friend of Bengal). This was perhaps the only occasion in the history of the world when a peoplecentric leader was ceremonially crowned with an honorific. This was, in fact, a people's return to a leader who had contributed so much to their cause.

On 1 March 1971, when a Pakistan radio broadcast on behalf of Yahya Khan, deferred indefinitely the National Assembly session scheduled in Dhaka on 3 March, the confused people had to rush to Bangabandhu to take the lead on the future course of action; and they got what they needed. Bangabandhu commanded that there be strike from 2 through 6 March; and also that the next directive be given on 7 March at the Race Course. During these days, things turned out as exactly Bangabandhu directed.

The 7 March speech was indeed the finest oral delivery by a leader who had grown to be the sole Bangali spokesman since the heady days of the 1966 Six-Point movement. Despite the rumoured declaration of independence in this speech, Bangabandhu said something in jugglery of words which amounted, in implied meaning, to such a declaration, but he did stop short of directly declaring so, and the crowd accepted the speech in the required spirit. Bangabandhu could do what he did in this speech as he had already had people's mandate for doing so. At one stage of the speech, he sought the mandate as he said, "Do you have faith in me?" The crowd responded in the affirmative as they gestured with their both hands in the air. Reciprocating the people's endorsement of his leadership, Bangabandhu made the frank confessional statement: "I do not want premiership. I want people's right." The speech was indeed a fine specimen of symmetry between the leader's charisma and people's acceptance of it. As the people listened to this speech, they, in the words of Andrew Newberg and Robert Waldman,[10] had their brain changed. No wonder that the entire non-cooperation movement was directed and shaped by Bangabandhu.

Bangabandhu was the leader of the Liberation War in absentia. He was the president of the Mujibnagar government; Syed Nazrul Islam, the Vice president, was acting president. That Bangabandhu could lead even in absentia and that the first capital (Vaidyanathlola) could be named after him were

certainly testimonies to the charismatic appeal Bangabandhu held for his followers.

That Bangabandhu's charisma extended beyond the borders of Bangladesh is initially attested to by the Indian premier Indian Gandh's lobbying with 67 heads of government/state for sparing the life of Bangabandhu when it had been reported that Pakistan would hang him for treason. On 10 January 1972, on Bangabandhu's home-coming day. The Guardian of London carried front-page news with the heading:

"As soon as Sheikh Mujib walks out of the Dhaka airport the republic of Bangladesh becomes a reality." We knew that without Bangabandhu Bangladesh was meaningless; but that the foreign press also realized the fact, was something related to Bangabandhu's worldwide charisma.

How much foreigners were attracted to Bangabandhu comes out in the words of Archer K. Blood, American Deputy Consul General in Dhaka in 1971. He draws a pen-picture of Bangabandhu in his succinct words.

Mujib's very appearance suggested raw power, a power drawn from the masses and from his strong personality. He was taller and broader than most Bengalis, with ruggedly handsome features and intense eyes. A non-nonsense moustache gave added strength to his face, as did the heavy rimmed dark glasses he invariably wore. . . his dress was that of a native politician.[11]

Moreover, "poet of Politics" was the epithet given to Bangabandhu not by his own people, but by the American media, a country the government of which had been anti-Bangabandhu and anti-Bangladesh ab initio; and which was certainly a proof of Bangabandhu's charisma transcending the borders of his own country and spreading across the world. It may be noted that of all politicians of all ages and countries, Bangabandhu was the one to be honored with such an epithet. On 5 April 1971, the Newsweek ran a cover-story on Bangabandhu wherein occured the following words.

Tall for a Bengali (he stands 5 feet 11 inches), with a stock of graying hair, a bushy mustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spellbound with great rolling waves of emotional rhetoric. "Even when you are talking alone with him," says a diplomat, "he talks like he's addressing 60,000 people." Eloquent in Urdu, Bengali and English, three languages of Pakistan, Mujib does not pretend to be an original thinker, he is a poet of politics, not an engineer, but the Bengalis tend to be more artistic than technical, anyhow, and so his style may be just what was needed to unite all the classes and ideologies of the region.

At the Algiers Non-Aligned Summit (5-9 September 1973), Bangabandhu had a 35-minute meeting on the sideline with Libya's leader Muammar al-Qadhafi, who had been known for his staunch anti-Bangladesh stance. After the meeting, while facing the waiting journalists, he raised hands in prayer for Bangladesh. There must have been chemistry emanating from Bangabandhu's charismatic personality which melted down Qadhafi's anti-Bangladesh psyche. During the same summit, Fidel Castro's meeting with Bangabandhu evoked a comment from the former which is oft-quoted: "I have not seen the Himalayas, but I have seen Sheikh Mujib. In personality and courage, he is like the Himalayas. I have experienced seeing the Himalayas."

During the 1973 Arab-Israel war, Bangladesh's total and active commitment to the Palestinian cause created a positive image of the country in the Muslim World; and an Arab journalist confided in his Bangladeshi counterpart: "Your Prime Minister has won half of Africa including Arab world in a big battle without firing a single shot."[12]

Concluding Words

That Bangabandhu was a visionary as well as the one who toiled to turn his vision into a reality is attested to by the gradual and cruel birth of Bangladesh. A supplementary part of this vision was to turn the war-devastated Bangladesh into a Golden Bengal (Sonar Bangla). But this part of the vision remained incomplete as his life was cruelly cut short. Bangabandhu's charisma drew him close to the hearts of not only his own people, but those of the ones across the world. He was thus a visionary and charismatic leader par excellence. In closing, the words of Churchill on Hindenburg (German president 1925-34) may be pertinent for Bangabandhu as well, if not the comparison.

Hindenburg! The name itself is massive. It harmonizes with the tall, thick-set personage with beetling brows, strong features, and heavy jowl, familiar to the modern world. It is a face that you could magnify tenfold, a hundredfold, a thousand-fold, and it would gain in dignity, nay even in majesty; a face most impressive when gigantic.[13]

Notes and References

1. Gary Wills, "What Makes a Good Leader," The Atlantic Monthly, 1994.
2. Jia Lin in commentary on Sun Tzu, The Art of War: Complete Texts and Commentaries, 2003, p.44 translated by Thomas Cleary.
3. Anne Kinsey, "What is Visionary Leadership", Google.
4. See Maximillan Weber, Theory of Social and Economic Organization. Chapter "The Nature of Charismatic Authority and its Routinization", translated by A.R. Anderson and Talcott Parsons, 1947. Originally published in 1922 in German; See also Christopher Adair-Totef, "Max Weber's Charisma", Journal of Classical Sociology, vol.5, no.2, 2005, pp. 189-204
5. Online editions.
6. Col. (retd.) Shawkat Ali's statement.
7. Psychiatrists suggest every human being is endowed with ESP; with some, this quality is pronounced.
8. This statement was secretly recorded by the Pakistan military intelligence, which Yahya Khan listened to and commented, "If Mujib betrays me I will fix him." History bears that Mujib did betray, but Yahya failed to fix him; and Mujib's betrayal culminated in the independence of Bangladesh.
9. Sheikh Mujibur Rahman, The Unfinished Memoirs (Dhaka: The University Press Limited, 2016), p.260.
10. Andrew Newberg and Robert Waldman Words Can Change Your Brain (Pennsylvania: Avery, 2012).

11. Archer K. Blood, The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat (Dhaka: The University Press Limited, 2002), p.47.
12. Cited in Syed Anwar Husain, "Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975)" in A. Majeed Khan (ed.), Twenty Great Bengalis (Dhaka: The University Press Limited, 2008), p.274.
13. The Right Hon. Winston S. Churchill, Great Contemporaries (London: Readers Union Ltd. and Thornton Butterworth Ltd., 1939), p. 111.

একটা ৫০০ টাকার নোট

জান্নাতুল ফেরদৌস
আইডি নং: ২০১৪৮৮১০৫১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০
ইকনোমিক্স বিভাগ

"চা গরম চা গরম!" শব্দে মুখরিত রেলস্টেশনটির এক কোণায় তিনটা বাচ্চা বসে আছে। বাচ্চা তিনটির উস্কখুস্ক চুল আর কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে যাওয়া জামা বলে দিচ্ছে এরা স্টেশনের টোকাই শ্রেণির কেউ। দুইটা ছেলে, একটা মেয়ে। ছেলে দুটির একজনের হাতে বেশ কয়েকটা খবরের কাগজ, আরেকজনের হাতে কয়েকটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল। মেয়েটা তার হাতের পুতির মালাগুলো নাড়তে নাড়তে ছেলে দুটির সাথে দিব্যি ফোকলা দাঁত বের করে হেসে যাচ্ছে। তার হাতের পুতির মালাগুলোতে রোদ পড়ে চিকচিক করছে। দূর থেকে দেখতে মনে হচ্ছে কোনো দেবশিশু রেলস্টেশনে এসে নেমেছে। মেয়েটি আসমা, এই রেলস্টেশনেই থাকে। রেলস্টেশনের পাশের বস্তিতে তার মাতাল বাবা দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে দিব্যি আছে। বাকি দুজন কাশেম এবং জামিল। তাদের অবস্থা এর চাইতে করুণ। এই শহরে এদের কেউ নেই। অবশ্য এদের দুনিয়াতে আপন কেউ আছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে। তবে এসব নিয়ে এদের বেশ একটা চিন্তিত মনে হলো না। নিজেদের মধ্যে এরা নিশ্চিন্তমনে গল্প করেই যাচ্ছে।

"কাইলকা কাশেম যে মাইরডা খাইতো।"
-শব্দকরে হাসতে হাসতে বলল আসমা।
"চুপ থাক আসমা, তোরে কয়বার মানা করসি এইডা নিয়া কথা না কইতে?" চোখ বড় করে আসমা কে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো কাশেম।

আসমার পক্ষ টেনে জামিল বলল,
"হেই চুপ থাকবো কেন? তোরই তো দোষ। কি করলি জীবনে চুরিটাও ঠিক মতো করতে পারোস না। আমারে দেখ এতোগুলা চুরি করসি, কেউ কোনোদিন ধরতে পারসে আমারে?" (মুখে অহংকার স্পষ্ট ফুটে উঠেছে)।
কাশেম মাথা নিচু করে আছে, কিছুটা মন খারাপ করে বলল, "আমি তো মানিব্যাগটা নিয়াই ফেলসিলাম। পিছন থেকে ওই শালা না দেখলে তো ধরা খাইতাম না। তাও তো জান নিয়া পলাইতে পারসি।"
"হ! নয়তো আইজকা আমরা তিনজন থেকে দুইজন হইয়া যাইতাম" বলেই আবার অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো আসমা।
আসমা ও জামিলের টিটকারি থেকে বাঁচার জন্যই বোধহয় কাশেম উঠে দাঁড়ালো, বলল,১
"টেরেন আইবার সময় হইসে। যাই গা। আজকা কমসে কম ১৫ বোতল বেচমু।"
জামিল: চল্ জাইগা।
৩ জন তিন দিকে চলে গেলো।

সাদামাটা শাড়ি পড়া একটা মেয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছছে, অযথাই রেললাইনে উঁকি দিচ্ছে মেয়েটি। যেন ট্রেন আসছে নাকি তা যাচাই করছে। মেয়েটির নাম নীরা। নীরা রেলস্টেশনের একপাশের গোল বেদিতে গিয়ে বসলো। ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে তাতে মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলো। হঠাৎ মাঝবয়স্ক

এক ভদ্রলোক তার পাশে এসে বসলো। আগ্রহ নিয়ে নীরার হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি। এ ও মনে হয় সমরেশ ভক্ত। নীরার হাতের বইটি সমরেশ মজুমদারের 'সাতকাহন'। কোনো ভূমিকা ছাড়াই লোকটা বলে উঠলো,
"আমার খুব পছন্দের একটা বই।"

নীরা সৌজন্যমূলক একটা মুচকি হেসে আবার বইয়ে মনোযোগ দিলো। এই ধরনের লোকদের কখনো প্রশ্রয় দিতে হয় না। প্রশ্রয় দিলে এরা নানান বিষয়ে আলোচনা করতে চায়।
লোকটা আবার বলে উঠলো "আপনি কি বিরক্ত হলেন?"
নীরা: না না, বিরক্ত হবো কেন?

লোকটা: আসলে কাউকে বই পড়তে দেখলে ভালো লাগে। আমার আবার একটু বেশি কথা বলার অভ্যেস আছে। একা বেশিক্ষণ তাই ভালো লাগে না। অথচ এতো লম্বা জার্নি করতে হচ্ছে একা।
নীরা আবার সৌজন্যের হাসি হেসে কথা শেষ করার চেষ্টা করলো।
লোকটা মনে হয় নাছোড়বান্দা ধরনের কেউ, আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলো নীরার দিকে, "কোথায় যাচ্ছেন?"
নীরা: জ্বি চট্টগ্রাম। আপনি?

পাল্টা প্রশ্ন করেই নীরার মনে হলো এটা বলা উচিৎ হয়নি। এখন লোকটা কথা বাড়াবে।
লোকটা: আমিও। বেড়াতে যাচ্ছেন?
নীরা: না। একটা চাকরির ব্যাপারে।
লোকটা: চট্টগ্রাম আমার গ্রামের বাড়ি। পেটের দায়ে এই শহরে থাকতে হচ্ছে। নয়তো চট্টগ্রাম কখনো ছাড়তাম না। কয়েকদিন পর পর না গেলে ভালো লাগে না।

কাশেম তার পানির কেস নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, মনমতো কাস্টমার খুঁজছে যার কাছে দু-এক বোতল বিক্রি করা যায়। কেউই খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। নীরার সামনে এসে দাঁড়ালো সে,
কাশেম: আপা পানি লাগবো?
নীরা: দাও একটা। কতো করে?
কাশেম: পনের টাকা।

নীরা পানির বোতলটা হাতে নিলো। তারপর নিজের ছোট্ট ব্যাগটা থেকে টাকা বের করতে গিয়ে খেয়াল করলো বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ভাংতি টাকাগুলো সে টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে এসেছে। অগত্যা ৫০০ টাকার একটা নোট বের করে কাশেমের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমার কাছে ৫০০ টাকার ভাংতি হবে?"
কাশেম হালকা মাথা নাড়লো, "এতো বড় নোটের ভাংতি তো হইবো না আপা।"
নীরা: তাহলে তো সমস্যা। থাক তাহলে পানি।
কাশেম: নেন না আপা। আমি ভাংগাইয়া আইন্না দেই?
পাশের লোকটা এ কথা শুনে আঁতকে উঠল, কাশেমকে ধমকে বললো,
"বলছে না লাগবে না পানি? বিরক্ত করছিস কেনো?"
নীরা খানিকটা বিরক্ত হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, "বকছেন কেনো?"
লোকটা: এদেরকে বিশ্বাস করবেন না। এরা ছিচকে চোর। এইসব পানি বিক্রি এদের বাহানা। সুযোগ পেলে ভদ্রলোকের এটা ওটা মেরে দেয়। আর এর পানিও যে ভালো তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। হয়তো ট্যাপের পানি বোতলে করে বিক্রি করছে।
নীরা: একটা মানুষকে না চিনেই এতো বড় কথা বলে ফেললেন? এটা কি ঠিক? হয়তো ওর মনে এমন কিছু ছিলই না।
নীরা: নাম কি তোমার? (কাশেমের দিকে তাকিয়ে)।
কাশেম: কাশেম।
নীরা: আমার নাম নীরা। এখন যাও তো কাশেম। চট করে এই ৫০০ টাকার নোটটা ভাংতি করে নিয়ে আসো। পারবে তো?
কাশেম: জ্বী পারমু।

নীরা: গুড, যাও। জলদি এসো। আমি অপেক্ষা করছি। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে।
নীরা ৫০০ টাকার নোটটা দিলো। চকচকে চোখে কাশেম নোটটার দিকে তাকিয়ে আছে। এতোবড় নোট সচরাচর দেখে না সে। নোটটা নিয়ে দ্রুতপায়ে হেটে গেলো কাশেম। নীরা দূর থেকে দেখছে কাশেম একটা টং দোকানে ঢুকেছে। কিছুক্ষণ পর দোকান থেকে বেরিয়ে এলো সে। একবার পিছন ফিরে নীরার দিকে তাকালো। তারপর ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো ছেলেটি।

লোকটা: এটা কি করলেন? আপনার মনে হয় ছেলেটা ফেরত আসবে? আপনি তো আচ্ছা বোকা। ৫০০ টাকা এইভাবে কেউ জলে ফেলে?
নীরা: দেখা যাক ফেরত আসে কিনা।
আবার বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলো সে।
লোকটা: এই ছেলে ফেরত আসবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি।
"আচ্ছা! বই থেকে মুখ না তুলেই বললো নীরা।
নীরা নিজেও জানে কাশেমের ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবু কেনো যেনো এই লোকটার সাথে অদ্ভুত এক বাজিতে যেতে মন চাইলো তার। নিজেও ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে দেখলো কী হয়।

কাশেম, জামিল আর আসমা ৫০০ টাকার নোটটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।
জামিল: এইটা তো মেলা টাকা (কণ্ঠে বিস্ময়)
কাশেম: খুব তো কইসিলি আমি পারি না। এইবার কিছু কইবি? ও আসমা। কিছু কইবি?
আসমা: হেই বেডি কি বেকুব নাকি? তরে কেমনে বিশ্বাস করলো?
কাশেম চকচকে ৫০০ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে গর্বের হাসি হেসে উঠলো।

"ট্রেন তো এসে গেলো। কই? আপনার ভাংতি পেলেন?"
তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো লোকটা।

নীরা কিছু না বলে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে বারবার। তাহলে কি বাজিতে হেরে গেলো সে? কিছুটা মন খারাপ হয়ে গেছে নীরার। কেন যেনো সে মনে প্রাণে আশা করেছিলো ছেলেটা ফেরত আসবে। এই লোকটার কথাগুলো ভুল প্রমাণিত হবে।
লোকটা আবার বলে উঠলো,
"ওই টাকার আশা ছেড়ে দেন। ওইটা আর ফেরত পাবেন না। শুনেন একটা পরামর্শ দেই। যাকে তাকে যখন তখন বিশ্বাস করবেন না। এতো বোকা হলে কি চলা যায়?"
নীরা কোনো জবাব না দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আর অপেক্ষা করার মানে নাই। ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেলো সে। লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। নীরার সাথে সাথে না আসলেই হয়। নয়তো পুরো রাস্তা তার এই বিষয় নিয়ে কথা শুনতে হবে। এটা কোনো ভাবেই চায় না সে।

ট্রেনে ওঠার আগ মুহূর্তে নীরা আরেকবার চারপাশ দেখলো। কাশেমকে কোথাও দেখতে না পেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ঝটপট ট্রেনে উঠে পড়লো নীরা। ট্রেন যখন হালকা চলতে শুরু করলো দূর থেকে একটা ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেলো। ছেলেটার হাতে একটা পানির বোতল আর কিছু খুচরো টাকা।

নীরার চোখ ঝলমল করছে। এতো খুশি মনে হয় নীরা কখনো হয়নি। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে। কাশেম দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর দৌড়ে লাভ নেই, ট্রেন ধরতে পারবে না সে। নীরা দূর থেকে কাশেমের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে খুব আপন কাউকে বিদায় দিচ্ছে সে। কাশেম বুঝতে পারছে না কি করবে। একবার টাকাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে একবার বোতলটার দিকে। এরপর নীরার দিকে তাকিয়ে কি মনে করে যেনো হাত নেড়ে বিদায় দিলো সে। শৈশব হতে এই স্টেশনে আছে কখনো কাউকে হাত নেড়ে বিদায় দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তার।

Ethics and Aesthetics in University Education: BUP's Axiological Approach

Prof Maj Gen (Retd) Mohammad Quamruzzaman
Adjunct Professor
Faculty of Business Studies

Introduction

Ethics are the moral responsibilities and acts of individuals and organizations towards others for the benefit of society. Aesthetics is the human possession of taste for beauty, nature, and arts. Axiological approach combines ethics and aesthetics which made *Homo sapiens,* 'human beings' the ruling species on the Earth. Anthropology shows how human ethics and aesthetics played in making and ruining civilizations. Polemology, a multi-disciplinary academic field dominated the arena of higher education since human existence that got influenced by axiology: ethics and aesthetics.

University education in Bangladesh got its new dimension with the involvement of patriotic Armed Forces who traditionally aspire ethics and aesthetics. Bangladesh University of Professionals (BUP) through its axiological approach infused light and brought a significant quantitative and qualitative change in our Country among the 50 public and 107 private universities. Latin *universitas magistrorum et scholarium* defines a university 'to be the universal community of teachers and scholars' for making free-thinking persons with humane and philanthropic traits. BUP endeavours to produce ethical and aesthetic professionals.

Historic Axiological Legacy

Homer's Iliad and Odyssey depict kalological aesthetics of Hellen. Valmiki's Ramayana, and Vyasa's Mahabharata describe aesthetics of Sita, Rama, Surpanakha, Krishna, Drupadi, Pandavas on Lanka and Kuruskhetra. Ptolemaic Queen Cleopatra, Julius Caesar, Pompey in 1st century BC made many polemologic human conflicts. These are the primary sources of various -logy, -ism, -ics, -gogy, -sophy, -cracy. Axiology made jurisprudence named after Justinia and Prudentia; Roman goddesses of justice and discipline.

Ethics and aesthetics are enforced through fights against unethical and anesthetic enemies and evils. The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman stressed on the importance of axiological approach in higher education for sustainable defence and development. He articulated Nation's hopes and aspirations while addressing the BMA gentleman cadets on 11 January 1975 at Cumilla. He forecasted, "In Sha Allah, the days will come when not only South Asia, but whole World will appreciate our quality of training and education."

BUP's Flagship Axiological Approach

Ethics and aesthetics are more of mental constructs that get physical forms in activities and actions. Contemporary literatures like Ahmed Sofa's (1995) Gabhi Bittanto, satirically reveals ethics and aesthetics in various universities. On the contrast Ahmed Sofa's (1998) *Jaddaypi Amar Guru* highlights on teachers and students' aesthetic synergies through mentor and mentee relationships. BUP along with affiliated institutes adopt and follow strong position and uncompromising standing on the issues of ethics and aesthetics.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University (BSMRMU), Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU) follow BUP's axiological flagship as military's 2 more public universities. Bangladesh Army University of Science and Technology (BAUST) at Saidpur, Bangladesh Army University of Engineering and Technology (BAUET) at Qadirabad, Bangladesh Army International University of Science and Technology (BAIUST) at Comilla are the military's 3 private universities who also get inspired by BUP's axiology.

Legal Aspects besides Ethics and Aesthetics

The BUP Ordinance 2008 got repealed by the BUP Act 2009. BUP became effective from 05 June 2008. There are 70 sections with a Schedule. 'Professionals' is defined in Sub-Section 2(19): a person or a student willing to study and who is either serving now or will be serving in future in any profession. Section 50 of BUP Act 2009 directs Bangla to be medium of education with English. It supports *Bangla Bhasha Procholon Ain 1987*. Section 69 prioritizes Bangla version of the Act over English. The Cantonments Act 2018 is applicable to BUP for its location.

Legal and Ethical Dilemma

Legal and ethical knowledge can be implicit or explicit which is own memories, senses, mental states, beliefs, perceptions, and thinking processes. All legal matters usually should be ethical and the vice versa, the ethical should be legal. Epistemology brings difference between these two, giving rise to legal and ethical dilemma. Tobacco or alcohol business is unethical but legal. Driving a patient to hospital emergency without license is ethical but illegal. Legally BUP and its affiliated institutes could remain closed in lockdowns but ethics kept them active 24/7.

Civil and Military Cooperation (CIMIC)

BUP has become a unique public university where synergies take place by meaningful interactions among civilians and military persons both serving and retired. Optimization in academic business is very encouraging through civilianizing, and militarizing. Pro-VC and many positions are decorated by civil comrades. Reciprocation by civil universities may strengthen CIMIC. Military uniform is the symbol of 'brain and brawn' - highly contributive to university education.

Individuals self-knowledge need to be weighed against each other as Plato asked for justification of knowledge in his *Theaetetus*. Socrates, an Athenian military polymath had been poisoned to death. Greek High Court honourably acquitted him after 2400 years to establish that Captain Socrates had been right. Debate and discourse may prevail as to claim who is more knowledgeable. Universities

appreciate polymaths and meritocracy. Monash, Macquarie, etc were military polymaths. 31 USA Presidents out of 45 are from military. WWI Lt Col and WWII UK Prime Minister Churchill won Nobel in literature in 1953.

Conclusion

BUP values and upholds ethics and aesthetics in every aspect besides legal obligations relating legislative Acts. BUP pioneers military's 3 public, and 3 private universities out of 50 public and 107 private universities. Epics by Valmiki, Vyasa, Homer, and other polymaths are the legacy of axiology. Epistemology identifies polemology to be the root of all -logy, -ics, -ism, -gogy, -cracy, and -sophy.

CIMIC helped Homo sapiens wining against enemies, diseases, and calamities. BUP officials, faculty members, and supporting staffs adopt axiological approach and CIMIC to improve moral values and aesthetics of effective teaching and learning. The participative academic environment and heuristics at BUP ensure disciplining teachers-students role and thought process.

BUP ensures synergies through motivation and hierarchies. Visionary VC and his competent team lead the way for followers by nurturing meritocracy. Axiological measures helped negotiating COVID 19 to continue academic activities unhindered. Polymaths from civil and military get priority in BUP affairs. Axiology: ethics and aesthetics optimize BUP effectiveness.

রাসেল আমার নাম

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ সালাহ্উদ্দীন
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব মেডিকেল স্টাডিজ

তোমরা কি ঠিক চিনেছ আমাকে? রাসেল আমার নাম
বত্রিশ নং ধানমন্ডিতে সেই যে আমি ছিলাম!
ছিলাম বলছি এই কারণে যে এখন তো আমি নেই
অনেকে আমার নামই শোননি, ভুলে গেছ অনেকেই।
বত্রিশ মানে- বত্রিশ নং ধানমন্ডির বাড়ি
যেখানে আমার ছিল সাইকেল, ঘুড়ি ও খেলনাগাড়ি।

তোমরা কি জানো! বত্রিশে রাখা আমার খেলনাগুলো!
আছে ঠিকঠাক? নাকি তাতে আজ জমেছে অনেক ধুলো!
নাকি সেই রাতে দুষ্টু লোকেরা সবকিছু ভেঙ্গেচুরে
নির্দয়ভাবে ফেলেই দিয়েছে ভাগাড়ে, আস্তাকুড়ে?

খেলনা আমার ছিল খুব কম। চাও না তোমরা মানতে?
কতো বায়নায় একটা খেলনা পেতাম যদি তা জানতে!
বাংলাদেশের অন্য দশটা ছোট্ট ছেলের মতন
সত্যি বলছি- আমিও ছিলাম একেবারেই সাধারণ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ছিলেন আমার পিতা
তাইতো কখনো শেখাননি তিনি অপচয় বিলাসিতা।

আরো ছিল কিছু কবুতর আহা, কী ভীষণ পোষমানা!
হারিয়ে যেতো না যদিও তাদের ছিল মজবুত ডানা
যখন তখন বসত আমার হাতের তালুতে, কাঁধে
আমার জন্য ওরা কি এখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে?

আচ্ছা বল তো কোন অপরাধে আমাকে তোমরা মারলে?
কী করে শিশুর প্রতি এতোখানি নিষ্ঠুর হতে পারলে?
আমার ছোট্ট মনের ভেতরে ছিল শুধু ছোটো আশা-
একটা জীবন এই দেশটাকে দেব শুধু ভালোবাসা।
আমার পিতার দেখানো পথেই হেঁটে যাব বহুদূর
সারা গায়ে মেখে ধুলোমাটি আর বুকে নিয়ে মেঠোসুর।

অনুরোধ করি শিশুর চোখের স্বপ্ন নিও না কেড়ে
ওরা ফেরেশতা জীবনের পথে ওদেরকে দিও ছেড়ে।
শিশুরা জ্বালায় পবিত্র আলো আলোহীন পৃথিবীতে
কী করে তোমরা পার সে আলোর মশাল নিভিয়ে দিতে?
আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি আজ অকপটে-
আবার আসব এই দেশে এই মায়াবী নদীর তটে।
যে মাটি রেখেছে ধরে জনকের পূণ্য পায়ের চিহ্ন
এ হৃদয় থেকে সে মাটির মায়া হতে পারে কভু ছিন্ন?

যতোবার খুশি মার না আমাকে, দূরে ছুঁড়ে দাও ফেলে
যুগে যুগে তবু হতে চাই আমি শেখ মুজিবের ছেলে।

মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান

তাহমিনা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

ডিপার্টমেন্টের প্রথম ক্লাসে স্যার বলেছিলেন মিথ্যা তিন প্রকার- মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান নিয়ে পড়াশুনা শেষে বুঝতে পেরেছি যে উক্তিটি সর্বোতভাবে সত্যি। এই উক্তিটি মানুষ পরিসংখ্যানকে নিয়ে রসিকতা করার সময় ব্যবহার করলেও এমন কথা বলার পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ সঠিকভাবে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ পদ্ধতি জানে। তাই সাধারণভাবে পরিসংখ্যানের সহায়তায় মিথ্যা বলা সম্ভব ।

উৎস: ইন্টারনেট

প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাজা-বাদশারা রাজ্যের লোকসংখ্যা গণনা, সৈন্যসংখ্যা গণনা, রাজ্যের অর্থের প্রকৃত হিসাব নিরূপণ ইত্যাদি কাজে পরিসংখ্যান ব্যবহার করা শুরু করেন ।

যদি কোনো কিছুর মান Exactly fixed বা সেটা যদি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তবে সেটা Pure Mathematics। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় এবং Projection বা Interpretation বা অনুমান করে মান বের করার প্রয়োজন হয় তখন সেটাই হলো পরিসংখ্যান। বেশকিছু আঙ্গিকে আমরা পরিসংখ্যান ভুলভাবে ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করে থাকি। যেমন:

- সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে তথ্য নিয়ে অন্য একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা বা অনুমান করা বহুল প্রচলিত একটি ভুল।
- ভুল sample বা নমুনা নির্ধারণ করা এবং এই ভুল sample এর মাধ্যমে পরিসংখ্যানকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

- যেটা থেকে ফলাফল বের করার পরে সেই ফলাফল আসলে কি নির্দেশ করে সেটা সঠিকভাবে না বুঝতে পারাও একটি ভুল।
- পরিসংখ্যানিক শব্দের প্রায়োগিক অর্থ যদি জানা না থাকে তাহলে এর মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা করা সম্ভব।
- গবেষণায় প্রাপ্ত সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে একপেশে তথ্য পরিবেশন করাও ভুল।

অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা

এফ.এম. রেডিওতে একদিন একটি কমেডি শো ধরনের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে দুজন বক্তার একজন একপর্যায়ে বললেন-"পরিসংখ্যানের ধারণাগুলো খুব মজার। আমার কাছে বেশ কিছু মজার ব্যাখ্যা আছে। উনার দেয়া ব্যাখ্যাটা ছিল অনেকটা এরকম যে মনে করেন একটি পাবলিক টয়লেটের সামনে ১০ জন মানুষ দাঁড়িয়েছে যাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলেন টাকা গ্রহণকারী, একজন হলেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী আর বাকি আট জনের এই মুহূর্তে টয়লেট ব্যবহার করা প্রয়োজন। এখানে আশি পার্সেন্ট লোকের টয়লেট ব্যবহার করার প্রয়োজন ।

এটা যদি একটা sample হয়ে থাকে, তবে এর উপর ভিত্তি করে বলতে পারি এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আশি পার্সেন্ট লোকের টয়লেট ব্যবহার করা প্রয়োজন। বক্তার এমন বক্তব্য শুনে আমি ভেবেছিলাম পরিসংখ্যান যদি কেউ বুঝতে বা ব্যবহার করতে চায়, তাহলে প্রথমে এই ধরনের ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা পরিহার করে তবেই পরিসংখ্যান বোঝার চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে ব্যাপারটা কোল্ড ডিংস ক্যান খোলার মত হয়ে যাবে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম-

পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে ৪০০০ কোল্ড ডিংসের ক্যান খোলা হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে দশজন মহিলা গর্ভধারণ করে, তার মানে এই না যে যতবার একজন মানুষ ক্যান খুলে তার চার ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা থাকে গর্ভধারণ করার। এভাবে যদি একটি ব্যাপারের এর সাথে অন্য একটি ব্যাপার যুক্ত করার যৌক্তিকতা বাস্তব জীবনে না থাকে তারপরেও যদি সেটা যুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয় তা অবশ্যই ভুল ।

৫০ বছর বয়সী এক স্কুল পরিদর্শক একবার গেলেন এক স্কুল পরিদর্শনে। নবম শ্রেণির ক্লাসে ঢুকে তিনি প্রশ্ন করা শুরু করলেন। প্রশ্ন হল- ধর, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দুরত্ব ২৮০ কি. মি.। তাহলে আমার বয়স কত? কেউই উত্তর দিতে পারছিলোনা। হঠাৎ পেছন থেকে একজন হাত তুললো। স্যার, উত্তর আমি বলছি- আপনার বয়স ৫০ বছর। পরিদর্শকতো অবাক হয়ে গেলেন! জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে পারলে? উত্তরে সে বললো- স্যার, আমাদের এলাকায় এক আধা পাগল আছে যার বয়স ২৫ বছর, এখন, আপনিতো পুরা পাগল, তাই আপনার বয়স ৫০ বছর। মূলকথা হলো প্রশ্ন যদি প্রাসঙ্গিক না হয় তবে পরিসংখ্যানের কী দোষ!!!

Sample নির্ধারণ সংক্রান্ত ভুল

Sample size নিয়ে একটি জোকস এর কথা মনে পড়ে গেল । জোকসটা অনেকটা এই রকম-তিনজন অধ্যাপককে ডিন এর সাথে দেখা করার জন্য ডাকা হয় যাদের মধ্যে একজন পদার্থবিজ্ঞানী, একজন রসায়নবিদ এবং একজন পরিসংখ্যানবিদ। অধ্যাপকরা দেখেন যে, ডিন অফিসের বর্জ্য ঝুড়িতে আগুন লেগেছে। পদার্থবিদ বলেন, "আমি জানি কি করতে হবে! আমাদের অবশ্যই উপাদানগুলিকে ঠান্ডা করতে হবে যতক্ষণ না তাদের তাপমাত্রা প্রজ্বলন (Ignation) তাপমাত্রার চেয়ে কম হয় এবং তারপর আগুন নিভে যাবে। রসায়নবিদ বলেন, "না! না! আমি জানি কি করতে হবে! আমাদের অবশ্যই অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে যাতে কোন একটি বিক্রিয়কের অভাবে আগুন নিভে যায়। পদার্থবিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদ কোন কাজটি করবেন তা নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন, তারা উভয়েই লক্ষ্য করলেন যে পরিসংখ্যানবিদ অফিসের অন্যান্য সমস্ত বর্জ্য ঝুড়িতে আগুন দিচ্ছে। তারা দুজনেই চিৎকার করে বলল,

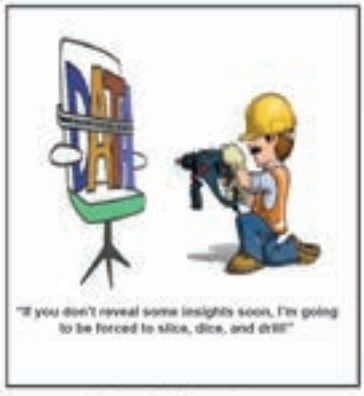

উৎস: ইন্টারনেট

"আপনি কি করছেন?" পরিসংখ্যানবিদ উত্তর দেন, "সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, আপনার অবশ্যই একটি বড় নমুনা আকারের (Adequate sample size) প্রয়োজন তাই পর্যাপ্ত নমুনা আকার (Sample size) পাওয়ার চেষ্টা করছি। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য Sample size সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিজের মন মত স্যাম্পল নিয়ে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্ত অনেকসময় ক্ষতিসাধন করতে পারে।

এক লোক অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার সবকিছু পরীক্ষা করে বললেন আপনার অপারেশন করতে হবে অপারেশনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। লোকটি ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তার তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। আপনার অপারেশন সাকসেস ফুল! লোকটা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ডাক্তার সাহেব এখনো তো অপারেশন হয়নি; আপনি আগেই কিভাবে বললেন? ডাক্তার বললেন, এটা এমন একটা রোগ যেখানে প্রতি ১০ জনে একজন মারা যায়। একটি গবেষণা রিপোর্ট সেটাই বলছে। আপনার সৌভাগ্য যে, গত মাসে সর্বশেষ এই রোগে একজন মারা গেছে। পরিসংখ্যান বলছে "আগামী ৯ জনের কিছুই হবে না"। সত্যি সত্যি আগামী ৯ জনের মধ্যে একজনকেও যদি চিকিৎসা না দেয়া হয় এই ভেবে যে ইতিমধ্যে একজন মারা গেছে পরবর্তী রোগীরা আর মারা যাবেন না তাহলে কি হতে পারে ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়। রান্না হতে থাকা হাড়ি থেকে একবার দুইটা ভাত নিয়ে টিপে দেখা হয়েছে সেগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা যদি কোন কারণে সেই ভাতটিই পুরো হাঁড়িতে একমাত্র সিদ্ধ ভাত হয়ে থাকে তবে পরিসংখ্যান কি মিথ্যা?

প্রয়োগিক অর্থ সম্পর্কে ভুল ধারণা

উদাহরণস্বরূপ Correlation এবং Regression এর কথা বলা যেতে পারে। একটি ফ্যাক্টর অন্য একটি ফ্যাক্টরের সাথে কিভাবে জড়িত সেটা হল Correlation আর কারণটা কি সেটা বের করা হলো Regression। এক্ষেত্রে কারণটি কতটুকু ভূমিকা রাখছে বা আদৌ ভূমিকা রাখছে কি না সেটা দেখা হয়।

উৎস: ইন্টারনেট

যে বছর বন্যা হল সে বছর ফসল খারাপ হবে এটা Correlation কিন্তু বন্যার কারণে যে ফসল খারাপ হবে সেটা জোর দিয়ে বলা যায়না ফসল খারাপ হবার পেছনে আরো অন্য কিছু অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। আবার বাংলাদেশে গরমকালে অপরাধ বেশি হয়। একই সাথে গরমকালে মানুষ আইসক্রিম বেশি খায়। তাহলে অপরাধের সাথে আইসক্রিম খাওয়ার একটা Correlation বের করা যায়। এখন যদি বলা হয় আইসক্রিম খাওয়ার কারণে অপরাধ বেড়ে যায় তাহলে কি ব্যাখ্যাটি সঠিক হবে? অবশ্যই না। কারণ ফ্যাক্টর এর মধ্যে শুধুমাত্র Correlation থাকলেই হবে না একটি ফ্যাক্টর অন্য একটি ফ্যাক্টরের কারণ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

সংবাদপত্রের শিরোনামে যদি লেখা থাকে "শিক্ষিত মেয়েরা ডিভোর্সের শীর্ষে" সে ক্ষেত্রে শিরোনাম পড়ে সাধারণভাবে এটাই চিন্তায় আসবে যে ডিভোর্সের কারণ 'শিক্ষিত মেয়ে' ও 'স্বাবলম্বী মেয়ে'। এক্ষেত্রে বলা যায় ডিভোর্সের কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। তবে একমাত্র কারণ হিসেবে 'শিক্ষিত মেয়ে' আর 'স্বাবলম্বী মেয়ে' ব্যাখ্যা করাটা অনুচিত হবে। অথবা যদি বলা হয় গবেষণায় দেখা গেছে যে "দক্ষ, সৎ ও কর্মঠ চাকরিজীবীরা চাকরি ছেড়ে দেয়ার শীর্ষে।" সে ক্ষেত্রে 'দক্ষ', 'কর্মঠ' ও 'সৎ ব্যক্তি' হলেই যে চাকরি ছেড়ে দেবেন এই ভাবনা ভাবাটা নিশ্চয়ই যৌক্তিক হবে না। হতে পারে ভালো বেতনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, মানসিক হয়রানির শিকার হওয়া বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হলে নিজের পছন্দমত চাকরির জন্য অনেকে চাকরি পরিবর্তন করছে। অতএব দু'টি ঘটনা সম্পর্কিত হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ হিসেবে দেখানো অনুচিত। একটা অপরটি ঘটার কারণ হতে পারে, আবার কাকতলীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

একপেশে তথ্য পরিবেশন

জর্জ কর্লিন বলেছিলেন 'Think about how stupid the average person is: now realize half of them are dumber than that' আসলে অনেক সময় নিজেদের উপযোগী সংখ্যার/তথ্যের দরকার হয়। তখন নিজের মতো করে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে পরিবেশন করা হয়। দু' একটা উদাহরণ দিলে স্ট্যাটিস্টিক্সের অপপ্রয়োগের ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ভালো ড্রাইভার: দুর্ঘটনার জন্য দায়ী অথবা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ড্রাইভার এর সংখ্যা তুলনামূলক বিচার করলে হয়তো দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে মহিলা ড্রাইভার এর হাতে দুর্ঘটনা কম হয়েছে । তবে মহিলা ড্রাইভার এর সংখ্যা (যাঁরা নিয়মিত গাড়ি নিয়ে বাইরে যান) পুরুষ ড্রাইভার এর সংখ্যার তুলনায় নগণ্য।

উৎস: ইন্টারনেট

কাপড়ের টুপি বনাম মেটালের টুপি: এটি একটি বিখ্যাত গল্প। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন পরীক্ষামূলকভাবে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য কাপড়ের টুপির পরিবর্তে মেটালের টুপির প্রচলন করা হলো তখন দেখা গেল আহত সৈন্যের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কেউ এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারল না। পরে বোঝা গেল যে আহত সৈন্যের সংখ্যা এভাবে তুলনীয় নয়। আসলে মেটালের টুপি সৈন্যদের মৃত্যুর হার নিশ্চিতভাবে কমিয়েছে তাই আহত সৈন্যের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

কিছু দিন আগে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সুনামি দুর্গতদের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় - মহিলা ও শিশুদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি এবং sex ratio অভূতপূর্ব কমে গেছে। ঐ রিপোর্টে দেওয়া অন্য তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল ৫০% মহিলার সঙ্গে সঙ্গে ৪৭% পুরুষও মৃত। এখানে ইচ্ছে করে একপেশে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

একজন ব্যক্তি তার মাথাটি ওভেনে এবং পা বরফে রেখে তিনি ভাল বোধ করছেন এমন ব্যাখ্যার কোন যৌক্তিকতা নেই। শুধুমাত্র সংখ্যা বা তথ্য পরিবেশ শেষ কথা নয়। সেই তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যাই পারে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে। ভুল ব্যাখ্যা (Misinterpretation) 'হয় কে নয়' 'নয় কে হয়' বানিয়ে দিতে পারে। ফলে পরিসংখ্যানের ব্যবহার নেতিবাচক হয় এবং মানুষের কাছে মনে হয় পরিসংখ্যান মিথ্যা ।

Nikola Tesla: A Crazy Scientist

Maliha Tabassum
Lecturer
Department of Mass Communication and Journalism

Many of us have heard about Tesla Car, the one in the line of electric vehicles produced by Tesla Motors, a company owned by Elon Musk. The company was named after Nikola Tesla, a 19th-century infamous inventor mostly known for making fallacious claims such as talking to aliens, conducting time travel experiments, and believing in worldwide wireless electricity.

Nikola Tesla was born in the early hours of July 10, 1856, at midnight. Outside the chamber where he was born, a violent lightning storm lit up the sky. According to family legend, the midwife stated, "This child will be a child of darkness." Lightning, she thought, was a bad omen. "No, his mother said," He will be a child of light" (Avondale Meadows Academy, 2020). Her prediction, however, came true. Tesla became a pioneer in the field of electric inventions.

Picture: Nikola Tesla

He was a Serbian immigrant who went to the United States in 1884. He championed and refined the AC system, which is still the global standard for power transmission. He was the first person to make an X-ray image (Peri, 2019) way before Rontgen. We, the Bengalis, are still arguing about Marconi stealing JC Bose's radio technological invention. Well, be disappointed to learn that Tesla demonstrated wireless radio transmission two years before Marconi. He never attempted to patent this idea because it was Ònot so significant" to him.

Throughout his life, he asserted and believed in a wide range of scientific principles that appear to be unachievable till date. This article is about some of his crazy, unbelievable experiments.

A Signal From Mars:

The invention and development of wireless telegraphy, presented a new technique of searching for messages from space in the late 19th and early 20th centuries. Nicola Tesla claimed in 1901 that he was receiving radio messages from Mars. He claimed that the aliens in mars are sending signals to Earth in binary numbers as numbers are universal language. His narrative was picked up and widely published in the media that time. But many scientists went against him. As there was no scientific evidence, it soon lost serious attention. However, Tesla spent almost 50 years of his time experimenting the Martian signals (Upworthy, 2019).

Picture: A book on Martian Signal

Supplying Current Without Wires:

The supply of electricity happens with the help of wire, as we know. But Tesla wanted to create a way to supply current without stringing wires. In 1899, at Colorado Springs, he lighted up a bank of 200 light bulbs by transmitting 100 million volts of high-frequency wireless electricity through a coil's magnetic field over a distance of 26 miles. He was, however, unsatisfied. He planned to expand his technology. He wanted to transfer wireless current worldwide. The system he wanted to develop was popularly known as 'World Wireless System'.

This impossible project resulted in Wardenclyffe Tower, commonly known as the Tesla Tower. It was an experimental wireless transmission station demonstrated by Nikola Tesla near the village of Shoreham, New York, between 1901 and 1902. Tesla planned to use his theories to send electricity, signals and even facsimile images over the Atlantic to England and ships at sea. J P Morgan invested $150,000 (equivalent to more than $4 million today) in the construction of the Wardenclyffe Tower.

Morgan was fascinated by Marconi's radio technology and wanted Tesla to work on it, but Tesla was working on something far bigger. Morgan soon realized Tesla's plan and refused to fund any further operations. Tesla attempted to complete the project, but he became heavily indebted. The Wardenclyffe Tower was destroyed in 1917, and the main structure became a photographic material plant. Imagine what would have if he really become successful in transmitting wireless current!!!

Picture: Wardenclyffe Tower

The Vanished Ship:

The USS Eldridge, a Cannon-class destroyer escort, was performing top-secret tests on October 28, 1943, in order to develop a technology that would make naval ships invisible to enemy radar. The entire experiment, including the generator supply, was reported to be designed by Tesla. Surprisingly, a peculiar magnetic field was formed, which not only made the ship unidentifiable in radar, but also made the whole ship vanish with all crew members. The ship was later spotted in Virginia's Norfolk Naval Shipyard before disappearing and reappearing in Philadelphia again. This experiment is popularized as 'The Philadelphia Experiment'. The event happened in the experiment is considered as a major success in 'Teleportation'.

But USA never admitted this event. This version of events is widely believed to be a fiction. The US Navy asserts that no such experiment was ever carried out, that the intricacies of the narrative contradict well-known facts, and that the supposed claims violate general laws of physics (Carroll, 2015). Another interesting fact is that Tesla died seven months before (January 7, 1943) the experiment. As a result, making claims that Tesla designed the entire experiment seems a little hazy.

Picture: The Vanished Ship, USS Eldridge

These are only a few instances of his wacky and ambitious ideas. Over eighty years before the Internet was developed, Tesla envisioned the smart phone and wireless internet! Tesla was a spiritually gifted man who predicted a train tragedy, and there are rumors of him predicting the Titanic's sinking. He allegedly declined the Noble Prize since he was being honored with Thomas Alva Edison, one of his business rivals.

His era never grasped what he meant when he said, 'The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine'. This insane man was never married, died poor, his works stayed unrecognized. Some claim he was a crazy scientist who happened to be born at the wrong time. What do you think?

References:

Carroll, R. T. (2015, November 21). The philadelphia experiment—The skeptic's dictionary—Skepdic. Com. http://skepdic.com/philadel.html

3 things you really want to know about inventor nikola tesla. (2020, July 11). Avondale Meadows Academy. https://avondalemeadowsacademy.com/3-things-you-realy-want-to-know-about -inventor -nikola-tesla/

Perry. (2019, February 15). After Tesla thought aliens contacted him, he described his "encounter" to the Red Cross. Upworthy. https://www.upworthy.com/after-tesla-thought-aliens-contacted-him -he-described-his-encounter-to-the-red-cross

The philadelphia experiment—The skeptic's dictionary—Skepdic. Com. (n.d.). Retrieved August 15, 2021, from http://skepdic.com/philadel.html

ক্ষুধা

নুসরাত জাহান
আইডি নং: ১৮১২১০০১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

লাশটা সামনে নিয়ে বসে আছে দুলাল মিয়া। তার মায়ের লাশ। না খেতে পেয়ে মরে গেলো তার মা। হাড্ডিসার একটা ছোট বাচ্চার মতন দেখতে লাগছে তার মা-কে। হবেই বা না কেন! মার বয়স ৭০ ছিলো যে! দুলাল মিয়া কাঁদছে না, এই দুর্ভিক্ষে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে যে পরিশ্রম হবে সে পরিমাণে শক্তি তো তার নেই। নিজেই গাছের সাথে হেলান দিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তার ১২ বছরের মেয়ে নিরুর দিকে তাকালো সে। হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শুয়ে আছে, নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে পরছে। আজকে রাতটা টিকে গেলেই অনেক হবে। বাচ্চার মার ভাগ্য কি ভালো! এই দিন দেখতে হয়নি। নিরুটাকে জন্ম দিয়েই মরে গেলো। ভাগ্যের উপর খুব করে মনে মনে হাসলো একবার দুলাল।

নতুন স্বাধীন দেশ, সবে দু বছর ৩ মাস পেরিয়ে । এই দেশের জন্য কত মানুষ জীবন দিলো! কতো মানুষ হাত পা খোয়ালো তার হিসেব আছে! সে নিজেও যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচর ছিলো। যদিও সে তার মা আর মেয়েকে নিয়ে ভারতে রেখে এসেছিলো, তাতে কি! সে দেশকে তো ছেড়ে দেয়নি। তাহলে তার বিপদে দেশ কেন তাকে ছেড়ে দিলো? তাদের দিন তো ভালোই যাচ্ছিলো। এক ফালি জমি ছিলো যার ফসলে তাদের ৩ জনের দিব্বি চলে যেতো। কিন্তু কি হলো, দেশের উপর নজর লাগলো কার এমন? '৭৪ এর শুরুতেই চালের দাম বাড়তে থাকলো, আর আগুনে ঘি ঢাললো ব্রহ্মপুত্র! বন্যার পানিতে তার সব ফসল ধুয়ে গেলো। ভিটে বন্ধক দিয়ে খুব আশা করে জমিতে ধান লাগিয়েছিলো সে। ক্ষেতের ধান বানে খেলো, আর জমি নিয়ে নিল মহাজন! জমিও নেই ঘরও নেই। তার মতন আরও আছে মানুষ। পাশে একটু দূরের গাছের দিকে তাকালো সে, শাহিন মিয়া পড়ে আছে! তার ছেলে তাকে রেখে পালিয়েছে, বুড়া এখন একা শুয়ে না খেয়ে মরছে, আর ২ দিন হয়তো বাঁচবে। ওই পাশে করিমন খালা! খালার এক নাতিন ছিলো গত সপ্তাহে মরেছে। খালা এর পর থেকে না খেয়ে আছে। চোখ খোলার শক্তিটুকুও নেই। দুলাল নিজে কয়দিন না খেয়ে আছে, মনেই নেই তার। গত শুক্রবার এক মনিব এসে এক বাটি করে ঘাটা দিয়ে গিয়েছিলো। নিরুটাকে তখন অল্প খাইয়েছে, তার মাকেও অল্প খাইয়েছে, জোর করেও বেশি খাওয়ানো যায়নি। না খেতে পেয়ে হয়ত ওদের খাওয়ার সখটাই মিটে গিয়েছে, কে জানে! আজকে আরেক শুক্রবার। আজকে যদি কেউ খেতে দিত! নিরুটাকে হয়ত কিছু খেতে দিতে পারতো সে। কেউ এলো না। সারাদিন কেউ এলোনা তাদের দেখতে। বুকে ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে দেশের উপর। কয়টা খেতে দিলে কি হতো? দেশ মাতার কি অভাব?

মায়ের লাশ নিয়ে বসেই রইলো সে। মাছি ধরছে, অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলো সে তার মায়ের দিকে। মায়ের চোখ গুলো খোলা। বন্ধ করা হয়নি। মনে হচ্ছে তার দিকেই তাকিয়ে আছে মা, কি যেন বলার চেষ্টা করছে!

রাতে ট্রাক এলো, যারা মরে গেছে তাদের নিতে। দুলাল মিয়া তার মেয়ের পাশে এসে শুয়েছে। একটু পানি দিয়েছিলো মুখে, খায়নি গড়িয়ে পরেছে দুইপাশ থেকে। একজন তার মাকে বস্তা দিয়ে ঢেকে উঠিয়ে নিয়ে ট্রাকের ভেতরে ছুড়ে মারলো। মানুষগুলোর দয়াও নেই আর। দুর্ভিক্ষ মানুষের খাবারের সাথে সাথে বিবেকটাও নিয়ে গেছে। কি করবে ওরা মা কে? ফেলে দেবে? পুতে ফেলবে? খুব জানতে ইচ্ছে করছিলো দুলালের। কথা বলার শক্তি নেই তাও আস্তে করে বললো, " কই নিতাছেন আম্মা রে?"

লাশ নেয়া লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললো
"লাশ ঘুইলা রাখা যাইবো না, কাকে, কুত্তায় খাইবো।"

কি ভেবে দুলাল বলে ফেললো, "আম্মা রে আস্তে রাইখেন কব্বরে। মরার আগে একটা নরম বালিসে শুইবার চাইছিন, আমি মাথার নিচে শুকনা পাতা দিয়া দিছিলাম।" তারপর আস্তে আস্তে বললো, "দুইডা শুকনা পাতা দিয়ে দিয়েন মাথার নিচে।" বলেই চোখ থেকে পানি পড়ে গেলো তার। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলো সে। লোকটা হাত বাড়ালো নিরুকে তোলার জন্য। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো দুলালের। "আইজকা রাইতটা থাউক। কাইল নিয়েন"। দুলালের মুখের কথাটা বাতাসে মিলিয়ে গেলো! যেন সে কখনও কথাটা বলেইনি। হারিকেনের আলোয় লোকটার চোখের পানি কেমন মুক্তার মতন ঝলমল করলো। দ্রুত মুছে ফেলে লোকটা মাথা নেড়ে চলে গেলো। নিরুর নিঃশ্বাস হাল্কা হয়ে আসছে। মেয়েটাকে অনেক আদরে জরিয়ে ধরলো দুলাল মিয়া। "কাইল তোরে মিডাই কিন্না দিমু নে হাট থিকা। আইজকা ঘুমাইয়া যা মা, অনেক রাইত অইলো তো।" "তোর বাজানরে মাফ কইরা দিস, তোর দাদিরে কইস আমি শাড়ি কিন্না নিয়া আমু আম্মার লাইজ্জা।" বলতে বলতেই মেয়েটা কেমন একটা ছোট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এর পর দুলাল এতো কান পেতে থাকলো তবুও আর নিলো না নিঃশ্বাস নিরু।

ইস্টিশন

মো: ইশতিয়াক ইউনুছ
আইডি নং: ২০১৪৮৮১০২১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
ইকনোমিক্স বিভাগ

ইমা কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছালো দৌড়াতে দৌড়াতে। ট্রেন ছাড়ার কথা দুপুর একটায়। এখন বাজে দুইটা সাত। রাস্তায় যতবার রিকশাওয়ালাকে বলেছে তাড়াতাড়ি যেতে, রিকশাওয়ালা ততবার আরো জ্যামের রাস্তা দিয়ে এসেছে। ভাড়া দেয়ার সময় দেখা গেলো একশ টাকা ভাঙতি নেই। পাশের দুইটা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেও যখন পাওয়া গেল না ইমা তখন চল্লিশ টাকা বেশিই দিয়ে দিলো। হাতে সময় নেই একদম।

বাংলাদেশে কোন কিছুই সময় মতো হয় না। স্টেশনের ক্ষেত্রে এই কথাটা এক ডিগ্রি বেশি সত্যি। ট্রেন কোথায় যেন আটকে গেছে, আসতে দেরি হবে। সে এগিয়ে খালি দেখে একটা বেঞ্চিতে বসে ব্যাগ খুলে একটা বই বের করলো। বইটার নাম One Hundred Years of Solitude, গত সাড়ে চার মাস ধরে পড়ছে। এখনো অর্ধেকও শেষ হয়নি।

ইমা বইতে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। স্টেশনের কোলাহলে সে বারবার ডুবে যাচ্ছে। ওর একটা বন্ধু আছে। অদিতি নাম। পুরো পৃথিবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মেছে। মাছের বাজারে ছেড়ে দিলেও জটিল সব থিওরি নির্বিকার ভঙ্গিতে পড়ে যেতে পারবে। পড়া শেষ হলে মাথা তুলে থিওরির দুই-চারটা ভুল নিয়ে দুই ঘন্টার লেকচারও দিতে পারবে। মাঝেমাঝে অদিতিকে দেখে ইমার হিংসা হয়। ওর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন না। বেশি শব্দ হলেই মাথা ধরে যায়। কড়া করে চা খেয়ে মাথা ব্যথা কমাতে হয় তখন। মনোযোগ দেওয়া তো বহুদূরের বিষয়।

ইমা বই ব্যাগে ভরে রাখলো। এই জায়গাটায় বড্ড ভীড়। অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। সময়টাও কাটানো প্রয়োজন। ইদানীং কিছুই ইমার ঠিকঠাক হচ্ছে না। এই পরশুর কথাই ধরা যাক। শখ করে নতুন একটা রেসিপি রান্না করতে গেছিলো। চিকেন আর পাস্তা দিয়ে ইতালিয়ান একটা ডিশ। সবকিছু রেডি করার পর দেখা গেল সব আছে, শুধু পাস্তাটাই নেই। মেজাজটা এত খারাপ হলো বলার মতো না। আবার আজকের এই ট্রেনের কাহিনী। বিরক্ত লাগছে।

বিরক্তি কাটানোর সহজ উপায় হচ্ছে মানুষ দেখা। স্টেশনে কত রকম মানুষ! প্রত্যেকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। একেকজনের কাজ দেখেই সারাদিন পার করে দেওয়া যায়। অল্প বয়সী এক ছেলের হাতে এক্সরে রিপোর্ট আর ডাক্তারের ফাইল দেখে ইমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাশে মধ্যবয়স্ক যে মহিলাকে দেখা যাচ্ছে রিপোর্টটা নিশ্চয়ই তার। ডাক্তারের কাগজপত্র দেখলেই মনটা কেমন যেন করে সবসময়।

ট্রেনের দেখা নেই। ইমা চা শেষ করে বইটা আবার বের করলো। পড়া হবে না সে জানে। তবু সময় কাটানোর বৃথা চেষ্টা চালানো। এরমধ্যে এক দফা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখনো কালো। আবহাওয়ার মতো কনফিউজড জিনিস ইদানিং খুব বেশি চোখে পড়ে না। এই গরম, এই ঠান্ডা। এই রোদ, এই বৃষ্টি।
'আপা?'

বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। মাথার চুল কাচা পাকা, উস্কখুস্ক। কণ্ঠে একটা সঙ্কোচ, চোখেমুখে হতাশা। দেখে মনে হচ্ছে ইমাকে পেয়ে কিছুটা আশা দেখেতে পাচ্ছে। খুব সম্ভবত সাহায্য চাইতে এসেছে। চিকিৎসার জন্য টাকা প্রয়োজন জাতীয় ব্যাপার। এমন হলে দশ বিশ টাকা দিলেই চলে যাবে। তবে ইমার কাছে দশ বিশ টাকা নেই। একশ টাকার একটা নোট ছিল। সেটাও রিকশাওয়ালাকে দিয়ে দিয়েছে।
'আপনারে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'
'জ্বি বলুন।'

লোকটা কীভাবে শুরু করবে সেটা বুঝতে পারছে না বলে মনে হলো। কিছুটা সময় নিয়ে বললো, 'করোনায় আমার চাকরি চলে গেছে। বড় মেয়েটা পলিটেকনিকে পড়ে। কেমিস্ট্রিতে। আর এক বছর আছে। রেজাল্ট মাশাল্লাহ ভালো। বলছে, রেজাল্ট এরকম ধইরা রাখতে পারলে নাকি বৃত্তি দিবে।' এটুকু বলে লোকটা থামলো। সে ঠিক কি চাইছে তা এখনো পরিষ্কার না। 'এখন আমার তো আয় রোজগার নাই। মেয়েটা টিউশনি কইরা যা পারে চালাইতেছে। আরো এক বছর আছে। মেয়েটা পাশ করার পর একটা চাকরি পাবে?'

স্রেফ এই কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই কি লোকটা এসেছে? নাকি সাহায্য চাইতে এসেছিলো, সম্মানের জন্য বলতে পারলো না? ইমা বুঝতে পারলো না। কয়েক মুহূর্ত লাগলো পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে। চাকরি পাবে কি পাবে না সেটা ও কী করে বলবে! আর এভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে রাস্তাঘাটে কেউ জিজ্ঞেস করে, আমার মেয়ে চাকরি পাবে না কি! তবে লোকটাকে দেখে আসলেই মায়া লাগলো। বললো, 'হ্যাঁ। চাকরি তো পাওয়ার কথা।'
'পাবে তো?'

'হ্যাঁ। পাওয়ার তো কথা।'
'আপনে শিক্ষিত মানুষ। তাই জিজ্ঞেস করলাম কথাটা। মনে কিছু নিয়েন না।' বলে লোকটা উঠে পড়লো। পুরো ব্যাপারটা ভীষণ অদ্ভুত লাগলো। লোকটার কথা শুনে মনে হলো আসলেই মেয়ের চাকরি হবে কিনা সেটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলো। কিন্তু এভাবে কেউ জানতে চায় নাকি! যা খুশি হোক। ইমা আরেক কাপ চা নিয়ে যেখানে মোটামুটি কম ভীড় সেখানে চলে এলো। স্টেশনের কয়েকটা বাচ্চা একসাথে গল্প করছে। কী নিয়ে সেটা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না। তবে বোঝা গেল খানিক বাদেই যখন বৃষ্টির ফোটাগুলো পড়তে শুরু করবে। সবগুলো বাচ্চা দলবেঁধে এক দৌড়ে প্লাটফর্মে গিয়ে লাফালাফি করতে করতে বৃষ্টিতে ভিজছে! ওদের চোখেমুখে আনন্দ বৃষ্টির মতো আছড়ে পড়ছে। পুরো স্টেশনে ওদের মতো আনন্দে আর কেউ নেই। ইমার মনে হলো, মেয়ে চাকরি পাওয়ার পর নিশ্চয়ই সেই বাবার মনেও এমন আনন্দ হবে।

আদর্শে বঙ্গবন্ধু

আলী মর্তুজা
আইডি নং: ১৯৫১১০৪৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯
আই সি টি বিভাগ

তুমি বাংলাদেশি বলিতে লজ্জা পাও,
তুমি বাংলায় বলিতে হোঁচট খাও,
তুমি নিজেকে সুশ্রী সভ্য সাজাও,
অন্যের সংস্কৃতি অলংকারে মাখাও।

তুমি উচ্চশিক্ষিত বটে আজকাল,
সাহেব সেজেছো ডিগ্রির পোশাকে বেশ,
তুমি কলমের শক্তিতে নীতি ধর্ম ভুলো,
তুমি অর্থেই কেবল সফলতা দেখো।

তুমি কি জানো কতটা ত্যাগ,
কতটা শ্রম দিয়েছেন জাতির পিতা।
তুমি কি ভাবো কতটা দেশপ্রেমিক,
কতটা দুঃসাহসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু!

হে তারুণ্য! তুমি কোথায় হারালে?
কোন কুঠিরে নিলে নিজেকে গুটিয়ে?
তুমি আজ ঝেড়ে ফেলো যত সংকীর্ণতা,
তুমি আজ বুকে ধারণ করো স্বাধীনতা।

তুমি আজ ভেঙ্গে পড়োনা সহসা,
সবুজ বাংলায় স্বপ্ন বুনো নতুনত্বের।
তুমি আজ বাঁচো প্রাণ খুলে,
মাথা উঁচু করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে।

বঙ্গবন্ধু নয় কেবলই কোনো নাম,
সে তো কোটি বাঙালির হৃদয় স্পন্দন।
আঁধার বিপদে বাঙালির আলোক মশাল,
সোনার বাংলায় সবার অহংকার।

আমি স্বপ্ন বলছি

মোছা: সানজানা হাসান
আইডি নং: ২০১৬৯৪১০৩৪, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ

আমি এক দুর্ভাগা বলছি-
জানতে চাও আমি কে?
আমি সেই স্বপ্ন
যে ছিল মায়াবী দুটো চোখের পাতায়,
যে ছিল আবেগে, কৌতূহলে-
আমি সেই স্বপ্ন
যে ছিল শৈশবে দুরন্তপনায়-
আমি সেই স্বপ্ন
যে ছিল বিশ্বাসে-
বড় কিছু হবার আশায়।
আমি সেই স্বপ্ন
যে ছিল আপন মায়ায়।
আমি সেই স্বপ্ন
যার বয়স সবে মাত্র বার কি তের!
আমি সেই স্বপ্ন
যে বেড়ে উঠেছে নিগ্রহে, লাঞ্ছনায়।
আমি সেই স্বপ্ন
যে মারা গেছে অশ্রুধারায়।
আমি সেই স্বপ্ন
যাকে হত্যা করা হয়েছে।
আমি সেই স্বপ্ন
যে তখনও মেতেছিল পুতুল খেলায়।
হ্যাঁ আমি বলছি -
সেই অভাগী কিশোরীর কথা
যে এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ -
আছে করুণ সুখের আশায়।

Addiction to Social Media: A Crux That We Cannot Look Beyond Anymore

Sanjoy Basak Partha
Lecturer
Department of Mass Communication and Journalism

Shafin (Pseudonym), an undergraduate level student, was a cheerful lad attached to sports and co-curricular activities. He used to play outdoor games with his friends regularly. During the Covid-19 pandemic, he was forced not to go outside and stay within the four walls. Looking for alternative options to spend his leisure, he latched on to his smartphone, which eventually created an addiction to social media.

This is not the only alone story of Shafin. The entire young generation suffers from social media intoxication, especially in this tough time of the Covid-19 pandemic. This is working as a 'digital drug', detaches youth from productive works that ultimately affect society's productivity.

Statistics provide enough support regarding this issue. As of January 2021, nearly 4.2 billion people have an account on various social media platforms. Facebook is the most popular among them, with more than 2.80 billion active users. According to data for 2020, Facebook costs an active user 2 hours and 24 minutes on average per day. If we look beyond Facebook, other apps, like You tube, costs nearly 40 minutes, Snapchat costs 30 minutes, and Instagram costs 28 minutes on average (Dayan, 2021). That means, if a youth uses all these four platforms, they are spending 4 hours on average per day for social media, which is one-sixth of the entire day.

Signs of Social Media Addiction:

Using social media for different reasons is a reality in this tech-friendly world. But using social media and getting addicted to this is not the same. Some common signs indicate whether you are a social media addict or not.

- **The first thing you do in the morning is to check your social media accounts:** If you possess the habit of starting your morning by checking your social media accounts, you are most likely suffering from social media addiction.

- **Lose your focus on social media during study/work:** If you cannot concentrate on your study or work for a more extended period and feel the continuous temptation to visit social media, it's a sign of social media addiction.

- **You get anxious when you are away from social media:** Social media addict person gets desperate to check social media repeatedly. If being away from your smartphone not and browse social media for a certain period makes you restless, you are more likely addicted to using social media.

- **You plan a lot of time for planning your social media life:** How should I write my post, how should I pose for my pictures, how my social media friends and followers will see it- if you are too much concerned about these staffs, be sure that you are a social media addict.

- **You are repeatedly checking how your posts are performing:** How many likes/ reactions I get on my latest picture, who is the latest to react on my post, who is leaving acomment in the comment box, why my post isn't getting expected reach/share- if you are constantly checking these things after giving a post, be again sure that you are addicted.

- **You prefer social media over family and friends:** If your priority is social media over your friends and family, you are seriously suffering from social media addiction.

How to detach from using excessive social media:

Understandably it's pretty challenging for a regular social media user to stay away from it, but it's not impossible to do so. Here are some practical tips for training yourself to stay away from using excessive social media.

- **Stay away from a smartphone while in study/work:** Do not keep your smartphone alongside you while you are studying or engaged in any work. The smartphone can draw your attention repeatedly and provoke you to check your social media. Eventually, it hampers your study or productivity. So, start practicing this trick from today.

- **Turn off all social media notifications:** It gets tough not to use a smartphone when it lights up frequently and signals that you have a new notification in your social media account. To avoid this, turn off all notifications so that you do not feel tempted frequently.

- **Increase self-control:** It is all about controlling yourself if you want to avoid continuous social media use. Yoga or meditation can be a helpful tool to increase self-control.

- **Avoid using smartphones 30 minutes before bedtime:** Experts recommend not to use any electronic device at least 30 minutes before you go to sleep. Using electronic devices immediately before sleep can negatively affect your sleep and health. Throw away your phone and pick up a book you like to read before you go to bed.

- **Say 'Yes' to books, 'No' to phone:** Books are the best possible companion one can get. Instead of spending maximum time on the phone, start practicing good books. On the other hand, it will enrich your knowledge and help you stay away from social media.

- **Lower your concern about social media appearance:** The more you think about it, the more you get attached to it. So, stop overthinking your social media appearance. Instead, focus on nurturing real-life skills.

- **Spend more time with family:** Spend more time with your family instead of scrolling through random videos on Youtube. Quality family time can motivate and inspire you for more considerable achievements.

*This write-up is inspired by a website named 'Time to Log Off.'

Reference:

Deyan, G. (2021). How Much Time Do People Spend on Social Media in 2021? Techjury. Retrieved from https://techjury.net/blog/time-spent-on-social-media/#gref

গাধা সমাচার

কাজী জান্নাতুল ইসলাম সিয়াম
আইডি নং: ২০১৬৯৪১০৫০, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ

পুরস্কারপ্রাপ্ত দুইজন গাধা অনুষ্ঠান শেষে মিডিয়ার সামনে এসে হাজির হলো। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ আর আলোর ঝলকানিতে মহল একদম জমে উঠেছে।

দ্বিতীয় গাধাকে উদ্দেশ্য করে শ্রদ্ধাভরা কণ্ঠে এক প্রশ্ন ভেসে এল, "আপনার এতবড় অর্জনের পেছনে রহস্যটা কী?"

গাধা সাহেব একটু চিন্তা করে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিলেন, আমি আমার এক দিনের অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার ১৬ ঘন্টাই ময়লার স্তুপের মধ্যে হাতাহাতি করে বেড়াই।

চারদিক থেকে বাহবার হুল্লোড় উঠে গেল!

এবার প্রথম গাধাকে আরেকজন প্রশ্ন করলো, "স্যার আপনিও কি এই একই কাজ করেন আর যদি উত্তর না হয় তাহলে আপনি এমন কি করেন যার জন্য আপনি সেরা বুদ্ধিমান গাধা অ্যাওয়ার্ডে প্রথম স্থান অধিকার করলেন"।

গাধা সাহেব চকিত হলেন, ঘাড়টা একদিকে নেড়ে চশমাটা চোখ থেকে নাকের দিকে অল্প টেনে নিয়ে দৃশ্যমান বিচক্ষণতার এক দৃষ্টি ক্ষেপণ করলেন যেন জ্ঞানের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যে কেউ দেখেই বলতে পারবে এ কোনো মহান গাধা।

তারপর চোখে চোখ রেখে কোনো পলক না ফেলেই বললেন, না আমি ওই গাধার মতো আবর্জনা হাতিয়ে সময় নষ্ট করি না। আমি বলতে গেলে দিনের পুরো সময়টাতেই ফেসবুকে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাই; তাদের সমালোচনা করি যার কোনো ভিত্তি নেই এবং এর সুফল কুফল খুঁজে বের করি। তাছাড়াও কোন নায়ক নায়িকা টয়লেট করতে পারলো, আর কে ই বা পারলো না তা নজরদারিতে রাখি, এমনকি পরিস্থিতি বিশেষে এই নিয়ে ৪০০/৫০০ শব্দের পোস্ট লিখি। এরকম হাজারো কাজের দায়িত্ব স্বার্থহীনভাবে নিজের পিঠে চাপিয়ে সারাদিন আমি ফেসবুকের মতো মহান কর্মক্ষেত্রে ব্যয় করি।

এই কথা শুনে চারপাশের মানুষের চোখ থেকে দরদর করে জল ঝরতে লাগলো। তবে এ জল দুঃখের নয় বরং আনন্দের, উল্লাসের এবং তা প্রমাণ দিতে সবাই মিলে সমস্বরে গাধার মতো ডেকে উঠলো...

Comprehension

Mirana Tahsin
ID: 2053201006, Session: 2019-20
Department of Environmental Science

There's a phrase that goes: time can heal all pain
Be wary of the notion that your endeavours were in vain.
Transitory nature of our world, makes everything uncertain
Remember that love and friendship cannot be forcibly gained
Human nature is extremely complex
Sometimes hoaxes make us perplexed.
Don't drink poison in quest of thirst
Act after you have given some thought first,
Lack of comprehension might result in destruction
Carrying it around no relationship can function.
People end up losing true friends in the long run
Considering them worthless or taking them just for fun,
Karma will always catch up with you
There is no way to predict the lessons it will convey to you.
The wheel of luck shall rewind
You can't help but question your mind,
Only then you will come to grips with the truth
Think about it carefully before you fall victim to ruth.

সবার জন্যে না

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
আইডি নং: ২০০১০৪১৪, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
আইন বিভাগ

কলেজে অধ্যয়নকালীন নানা স্মৃতি আজ মন্টুর মনের আনাচে কানাচে বেশ সাড়া ফেলছে। ঠিক যেমনটি বিকেলের সূর্য বাঁশের বেড়ার ফাঁক গলে এক অদ্ভুত রশ্মিমালার সৃষ্টি করে।

আজ নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে তার। একসময় পদার্থবিজ্ঞানের অসীত স্যার তাদের কথাপ্রসঙ্গে একটি গল্প বলেছিলেন। যার সারবস্তু অনেক গভীর বলেই মন্টুর মনে হয়েছিলো।

সেই গল্পে এক বিশাল দাওয়াত বাড়িতে এক রাস্তার ফকির গেল পাকস্থলীর জ্বালা নিবারণে। সে বাড়ীর কর্তাব্যক্তিরা নিতান্তই দয়ালু এবং ভালো মানুষ হওয়ায় তাকে আহার করার সুযোগ করে দিলেন। তবে যতই দয়ালু হোক না কেন সমাজ বলেও তো একটা বিষয় আছে, আর তা তো সবাইকেই রক্ষা করে চলতে হয়। তাই সেই ফকিরের আসন হলো নিতান্তই নিম্নশ্রেনির মানুষের সাথে।

তবে দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য তা ওপরওয়ালাই ভালো জানেন- তার সে আসন থেকে বাড়ীতে যে প্রধান অতিথি বা যারা খুব ভালোভাবে দাওয়াতপ্রাপ্ত তাদের দেখতে পাচ্ছিলো। তার একথা মনে হয়েছিলো কারণ তাদের যত্ন আত্তির কোনো কমতি হচ্ছিলো না। পাতে তরকারী কি ভাত, কোনটিরই বিচ্ছেদ ঘটছে না যেন! থাকতেই দেয়া হচ্ছে, থাকতেই আরও দেয়া হচ্ছে।

তবে এসব দেখেও সে সন্তুষ্ট চিত্তেই সব গিলছিলো। কারণ পরিমাণ যাই হোক, উপাদান তো আর বেশি নয়! তার পাতে যা যা আছে তাদের পাতেও তাই-ই আছে, শুধু পরিমাণটা একটু কমবেশি, এই আরকি।

তবে ঘটনাটা ঘটলো খাবার পরিবেশনের শেষ প্রান্তে- সে আহারে মোটামুটি তৃপ্ত, তবে একটা জিনিস দেখে তার তৃপ্তি হঠাৎ উবে গেল। কর্তাব্যক্তিদের খাওয়া শেষ হতে তাদের পাতে চামচে চামচে কি যেন ঢালা হচ্ছে। অথচ বাড়ির লোকেরা কতটা নিষ্ঠুর, তার দিকে একটিবার ঘুরেও তাকাচ্ছে না!

অনেকক্ষণ ধরেই খালি পাত সামনে রেখে উশখুশ করছিলো সে, ভাবছিলো তারও সময় আসবে সে অমৃত চাখার! কিন্তু নাহ্, সে সময় আর এলো কই!

শেষে একজন বাড়ীর লোক যিনি একটু আগে একজন কর্তাব্যক্তির পাত সে অমৃতে ভরে দিচ্ছিলেন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেই ফেললো- "কত্তা, ওসব কি খাচ্ছে তারা পরম তৃপ্তিতে?"

তারপরই লজ্জার মাথা খেয়ে তার অনুযোগ- "কই আমি তো পেলেম না!"

এ কথা শুনে কর্তার নির্দয় মনেও কিছুটা রসের সঞ্চার হলো। তবে যতই রসবোধ আসুক না কেন, সে দ্রব্য যে সবার জন্য নয় তা বোঝাতে কর্তা বেশি বাক্য ব্যয় করলেন না-

"আরে চামর! ও তো দই, আর দই সবার জন্য না!"

স্যারের গল্পের ভাবার্থ মন্টু যথার্থ ধরেছিলো কি না তা সেসময় সে ঠাওর করতে পারে নি। তবে জীবনের এ চরম হতাশ মুহূর্তে যেন গল্পের সে অভাগার স্থানে নিজেকে বারবার দেখছে আর বলছে- "ও তো দই, সবার জন্যে না! সবার জন্যে না!!"

She will Read Me Today

Raufur Rahman
ID: 2024161064, Session: 2019-20
Department of Business Administration in Management Studies

I'm the book on your 4th shelf.
Right next to me lies ''The boy and the Elf''

It's a hot summer day,
And I'm sure you'll read me today.
But you go for "Shakespeare" instead.
So today, I'll not be read.

But the enjoyment in your eyes,
The twinkling and the shine..
Makes me feel just fine.

It's a cold winter day,
And I'm sure you'll read me today.
You come up to the shelf.
I can feel your breath.
Taking a sip of your coffee.
You choose "Blake"
And I encounter a tsunami in my lake.
I guess it's okay,
Even in dismay, I find peace.
Know that,
My love for you will never cease.

But hey,
I finally understand my place.
I am the book,
lying on the shelf that you won't read,
That you'll never read.
And neither you will throw away.

Still I think…
…Maybe She'll read me today.

'সাধারণ' আর 'অসাধারণ'

এয়ার কমডোর মুহাম্মদ কেরাল
বিইউপি, এনডিইউ, এনডিসি, পিএসসি, জিডি(পি)
ট্রেজারার

'সাধারণ' আর 'অসাধারণ'। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী, সে সম্বন্ধে স্কলাররা চাইলে হাজারটা বই লিখতে পারবেন। কিন্তু আমার কাতারের শ্রেণিভুক্ত যারা, তাদের বুঝার জন্য এক কথার সহজ পার্থক্যটা হলো: সাধারণকে প্রচলিত প্রথা, নিয়ম-কানুন দিয়ে বিচার, বিশ্লেষণ করা সম্ভব; কিন্তু অসাধারণদের বেলায় ঐ একই সূত্রে ফেলে বিচার করা, এক বাক্যে অসম্ভব। কারণ, গনমানুষের জন্য তাদের রেখে যাওয়া অবদানই ঠিক করে, স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজ নিজ শ্রেষ্টত্বের মাপকাঠি, অন্যকিছু নয়।

জাতির পিতার অবদান, তাঁর দর্শন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি- এসব কিছুর বিচারে, তিনি যে অনন্য ছিলেন, তা আজ গোটা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। সে অনুযায়ী তাঁকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা, লেখা-লেখি ও বিশ্লেষণ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এ ধারা যে হাজার বছর ধরে চলবে, তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। কারণ, গনমানুষকে ভালবেসে, তিনি সর্বদা তাদের মুক্তির চিন্তা ও চেতনায়, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সংগ্রাম করে গেছেন। এ বিষয়টি বিস্তর আলোচনা করা মীমাংসিত সত্য। তাই, মনে করিয়ে দিতে চাই- তর্কের মাধ্যমে দুজনের মধ্যে কে সঠিক তা নির্ণীত হয়; কিন্তু আলোচনার মধ্যদিয়ে, সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় কী কী সঠিক; কে সঠিক, তা কিন্তু নয়।

রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল এবং কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তথাকথিত শ্রেণি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, যে দুটি ক্ষেত্রে অঙ্গুলি তুলেন তা হল: (১) প্রশাসক হিসাবে তার ব্যর্থতা, (২) এক দলের শাসন, বাকশাল প্রবর্তন করে- গণতন্ত্র কে হত্যা। আমি অতি সাধারণ একজন হয়ে, এ দুয়ের সহজ, সরল ও সোজা-সাপ্টা জবাব, এ লেখার মাধ্যমে তুলে ধরছি।

শুরু করার আগেই বিনীত অনুরোধ রাখছি, যুক্তি রাজ্যের দরজাটা একটু খোলা রাখবেন। না হলে তালগাছটি আমার কবিতাটি মুখস্ত আওরাতে থাকুন, জীবনভর; কারণ, বিষয় ভিত্তিক যে কোন আলোচনা, আপনার জন্য সঠিক ফোরাম না।

প্রকৃত নেতারা যুগ যুগ ধরে তাদের দর্শন, ভিশন বা প্রোগ্রাম দিয়ে গেছেন। তাদের সেসব দর্শন কার্যকর করতে সমাজকে গড়ে তুলতে হয়েছে, শক্ত এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সত্যি কি না বই পুস্তক দেখে এর সত্যতা পরখ করে নিতে পারেন। বিগত যুগের নথিভুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, এর স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। না হলে- আরিস্ট, প্লেটো, জন লক, ম্যাকাভেলী, কার্ল মার্কসদের দর্শন সত্যিকারভাবে প্রয়োগ করতে, সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে শিক্ষিত করা বা হওয়ার সময় দিতে হয়েছে, সকল বিকশিত সভ্যতাকে? কিন্তু আজকের সময় ও সমাজ উভয়ই হয়ে গেছে, ভীষণ গতিময়। তাই জরুরি পরিবর্তন আনা যখন কোনো সমাজের কাঙ্খিত লক্ষ্য হয়, যেমন- সিংগাপুরের লী কুয়ান, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহম্মদ, দক্ষিন কোরিয়ার পার্ক চুঙ'রা কিন্তু এসব বিধিভুক্ত বই তত্ত্ব অনুসরণ করে, নিজেদের দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেননি। করেছেন, তাদের সমাজের সমসাময়িক অসুবিধা ও শক্তিগুলো মিলিয়ে, তার সাথে নিজেদের দর্শন কড়াকড়ি করে সফলভাবে প্রয়োগ করার ফসল হিসাবে এনেছেন, সে কাঙ্খিত সাফল্য। এটা মানেন তো, সবাই? এখন আসি, বঙ্গবন্ধুর প্রথম প্রশ্নটির সরলীকরণ উত্তরে: এক- বইয়ে লেখা আছে: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ও শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিই দিতে পারে, একটা দক্ষ ও উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমাজ। হঠাৎ করে স্বাধীনতা পেয়ে যাওয়া দীর্ঘদিনের শোষিত বাংলাদেশ, উল্লিখিত চারটি ক্ষেত্রেই ছিল ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ও পিছিয়ে। শত শত বৎসর ধরে ভৃত্য হিসাবে বিশ্বাস, অবিশ্বাসের মধ্যে বাস করে, বাঙালী সমাজের নৈতিকতার মানদণ্ডটিও হয়ে গিয়েছিল বেশ নিম্ন পর্যায়ের; এজন্যই তো কবিগুরু বলেছিলেন- "সাত কোটি সন্তানের, হে মুগ্ধ জননী/রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করনি"।

তাই, বঙ্গবন্ধুর একার পক্ষে রাতারাতি বাঙালি সমাজের এই স্বভাবগত বৈশিষ্টের আমূল পরিবর্তন করে ফেলা, বা তা চাওয়াটা কি, বাস্তব সম্মত? আর তার কাছে স্বাধীনতার জন্য নেতৃত্ব ও তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করে নিয়ে, নিজেদের আলাদা পরিচয় অর্জন করার পরপরই, ২/৩ বছরের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্ধস্ততা কাটিয়ে না উঠতেই, আবার তাঁর কাছেই: ভাত, কাপড়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সব আশা করাটা, কতোটা যুক্তিযুক্ত, আপনার বিবেকের কাছেই আজ আমি, এ প্রশ্নটা রাখছি? রাসুলে করীম (সাঃ) ছাড়া, বিশ্বের আর একটি নেতার এসব কিছুর এককভাবে সমাধান বের করে দেওয়ার কি, পূর্ব কোন নজির আছে?

দুই- বঙ্গবন্ধু ৯ মাসে সংবিধান দিলেন। যুক্ত করলেন- গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। শক্ত প্রশাসনিক ভিত্তির জন্য, আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে স্বাধীন করে দিলেন; এদের কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল থাকবে না। এবং এরা একে অন্যের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে, সেই চেতনা থেকে। প্রশাসন কে গতিশীল করতে, পার্লামেন্টারি ইলেকশনসহ জেলা- মহাকুমা গভর্নর, ইউনিয়ন পরিষদ ও তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, সিক্যুয়েন্স ও কীভাবে হবে- তাও বলে দিলেন পরিষ্কার করে। আজ পর্যন্ত উন্নত দেশগুলিসহ, আমরাও কি এখনো পেরেছি তার দেওয়া রাষ্ট্রীয় প্রেসক্রীপশনটি সঠিকভাবে প্রবর্তন করতে? তাহলে কোন যুক্তি, শিক্ষা বা বিশ্বাসে, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে, আপনি এ প্রশ্নটি করতে চান?

তিন- বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করলেন ডা. কুদরত ই খুদার শিক্ষা কমিশন; ঘোষণা হলো স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রীয় মূলনীতি। সেনাবাহিনী, ক্যাডার সার্ভিস, পুলিশ, ট্যাক্সেশন, শুল্ক ও গোয়েন্দা বিভাগের পুনঃ প্রতিষ্ঠাসহ তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও, তিনিই করলেন। অভিজ্ঞতার ঘাটতি পূরণে সরকারে নিলেন বেশ কিছু টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী। পুনরুদ্ধার করলেন ভাঙ্গা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রেলওয়ের ৩০০ কালভার্ট ও ব্রিজ; রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, রেশন কার্ডের প্রবর্তন, টিসিবি কর্তৃক ন্যায্যমূল্যের দোকান, যার সমস্ত মালামাল কালোবাজারে বিক্রি হতে দেখা যেতো, সেই সময়ে; স্টুডেন্টদের জন্য বিনামুল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থাসহ গরীবের জন্য লঙ্গরখানা ইত্যাদি অসংখ্য প্রশাসনিকভাবে ও নানামুখী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ নিলেন। এ কাজ গুলি কি প্রমাণ করে না, দেশের প্রতি তার দায়িত্ব বোধ, প্রজ্ঞা ও ভালবাসায় কখনো কোনোদিন ঘাটতি হয়নি?

চার- শুরু করলেন সবুজ বিপ্লব। যুদ্ধ ঘোষণা করলেন- সুদখোর, মুনাফাখোর, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও তার নিজ দলে আশ্রিত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে। মাঠে নামালেন আর্মিকে বর্ডারের দায়িত্বে; বাজারে বাজারে রক্ষীবাহিনী ও পাড়া-মহল্লায় মাথায় লালপট্টি বাঁধা, লাঠি নিয়ে লাল-বাহিনী। দুর্নীতি রুখতে তার একার নেওয়া এতোসব করুন আর্ত চিৎকার, আপনার কানে কি পৌছায় নি?

পাঁচ- বাম রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করতে সর্বাত্মাক চেষ্টায় রত হলো। প্রশাসন যন্ত্রের ভিতর উসকানী এবং অজকাঅ (Arakan Rohingya Solidarity Arm) এর মতে করে, নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, নাজুক প্রশাসন যন্ত্রকে আরো বেহাল করে ফেললো তারা। অসহ্য বোবা যন্ত্রনায়, বঙ্গবন্ধু বলতে বাধ্য হলেন- "দেশ স্বাধীন হলে সবাই পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি"। সেই সময় দেশি/বিদেশি পরাজিত শত্রু'রা শুরু করে তাদের সকল জঘন্য অশুভ তৎপরতা। এতোসব কিছুর যোগফলে ঘটে যায়- ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও জঘন্যতম রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত হত্যাকান্ড, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। স্বপরিবারে নিহত ও শহীদ হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ধ্রুবতারা, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান; তার সাথে থেমে গেলো প্রজ্জ্বলিত বাঙালির সদ্য চালু হওয়া, সেই অপ্রতিরোধ্য বিজয় রথটির সামনে যাবার চাকা। এখন প্রশ্ন আপনার কাছে -তখন পার্লামেন্ট জীবিত। জীবিত প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্ট ও আপিল কোর্ট; জীবিত মন্ত্রীপরিষদ ও সকল সেক্রেটারি, আমলা; জীবিত- আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ-আনসার বাহিনী ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল প্রশাসনিক দায়িত্বে দুর্বল/সবল হোক- সকলেই। তারা কোনো দায়িত্ব সেদিন কেউ পালন করলো না, বা করতে চায় নি। এর দুটো অর্থ দাঁড়ায়। এক- তারা সবাই তা'হলে হত্যা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল, যা মোটেই সত্য নয়; দুই- তারা কেউ নৈতিকভাবে এ'অন্যায়ের সামনে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। উভয় ক্ষেত্রেই সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে, প্রশাসন যন্ত্রে নিয়োজিত সকল শ্রেনী-পেশা, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল। এখানে বঙ্গবন্ধুকে প্রশাসনিকভাবে একা দুষা, তালগাছটি আমার; অথবা এটা রাজনৈতিক মামদোবাজি, অথবা দয়ালবাবা ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন- হবে আমার উত্তর এবং চূড়ান্ত মন্তব্য।

আপনি বলবেন, উনি তো এদের সাথে যুদ্ধে জিততে পারেননি। আমার প্রশ্ন, কেন পারেন নি? আপনার কি জানা আছে? আমি যেটুকু জানি, সেটা এ'লেখার শেষ প্যারাতে বলি, কেমন? এখন আসি দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'বাকশাল' গঠন ও সে জন্যে গণতন্ত্র হত্যাকারী প্রশ্নে-

বঙ্গবন্ধু কোনো সাধারণ কান্ডারের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁর সু-দীর্ঘ সংগ্রামী পথে মোট ১৮ বার, ১৪ বছর জেল জীবন কাটানো, এর সোজা-সহজ উত্তর। ১৯৪৯ এ মুসলিম আওয়ামী ছাত্রলীগ; ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৫ তে আওয়ামী লীগ, ১৯৫৬ তে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করার আগে, বাংলা প্রদেশ না পূর্ব বাংলা রাখা ঠিক হবে, সে সম্বন্ধে জনমত গ্রহণ শ্রেয়তর হবে বলে কাগমারী সম্মেলনে তোলা প্রস্তাব; ১৯৬৬ তে ছয়দফা; ১৯৬৯ এ বাংলাদেশ নামকরণ ও দেশের মানুষের স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে ভূষিত করা হলো, সংক্ষিপ্ত করে- তার অসাধারণত্বের সনদ। তিনি রাজনীতিতে, মানুষ কে মানুষ হিসাবেই গণ্য করতেন সব সময়; হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্ম, গোত্র বা গোষ্ঠি হিসাবে কখনই দেখতেন না, হলো তার অসম্প্রদায়িক, মানবিক পরিচয়। এখন আসি সেই মহা সংকটের প্রশ্নে-

(১) গণমানুষের অধিকারের প্রশ্নে সু-দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে একবারো বঙ্গবন্ধুকে কখনই পিছপা হতে দেখা যায় নি।

(২) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জেল, জুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করে, সংকল্পে অটল থাকার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন তিনি, সবার অন্তরে।

(৩) বাঙালী জাতিসত্ত্বার মুক্তি ও অধিকার আদায় করার জন্য খাঁটি নিবেদিত প্রাণ আত্মা ছিলেন তিনি, এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর জীবিত থাকাকালীন মুহূর্ত পর্যন্ত নিজে, বা নিজের পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষণে সম্পদ সংগ্রহ বা কোনো সুবিধা নিতে, কখনো তাঁকে দেখা, বা শুনা যায়নি।

(৪) স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত, এ দেশের মানসিকতা ছিল পরাধীনতার মন-মানসিকতা। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি ও অভ্যাসে, জাতি ছিল সত্যিই পশ্চাৎপদ; তিনি তা জানতেন। কিন্তু সহজ সরল খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিল তাঁর খাঁটি বিশ্বাস ও ভালবাসা।

এমতাবস্থায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গনতন্ত্র বোঝে, জানে ও তা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাকি জানতো রাজনীতির নীতি নির্ধারকগণ, শিক্ষিত সমাজ এবং প্রশাসন যন্ত্রে নিবিষ্ট জনসমষ্টি? সঠিক উত্তর হলো, 'না'। গণতন্ত্র নির্ভর করে, ঐ সমাজের সার্বিক অবস্থার উপর। যেমন, এখনও কিছু আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা, বলকান ও কিছু এশিয়ান দেশগুলিতে বিরাজমান গণতন্ত্রের অবস্থা, পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিন। কিন্তু, বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক আলোকবর্তীকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতি সত্তার পরীক্ষিত প্রেমিক। যখন সর্বাত্মক চেষ্টায় তিনি কাউকে সাথে পেলেন না, তখন-

(১) মার্শাল টিটো তার বন্ধু ও বিশ্বস্ত জন হিসাবে তাকে আশ্বস্থ করেছিলো - এমন পরিস্থিতিতে, তার মতো ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে, দেশের দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করাই হবে, বঙ্গবন্ধুর সাফল্যের জন্য উত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট চাবি।

(২) তিনি দেখলেন- সকল রাজনৈতিক পরিবেশ, সমাজ, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা কেউ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না; নিজের পেট ছাড়া তাদের কারো কাছে, জাতীয়তাবোধের কানাকড়ি কোনো মূল্য নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নন; তারকাছে, 'জাতির সুখ আর দুঃখ' এই দুইই হলো তার মূল আদর্শ; পার্টি, নিয়ম কানুন, বিধি-বিধানের উর্ধ্বে উঠতে পারার জন্যই তো তিনি হয়েছেন- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। তাই, নিঃস্বার্থভাবে নিজের মত করে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠন করলেন- বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ, বাকশাল।

(৩) অফিসে প্রবর্তন করেছিলেন, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য, চাকুরিচ্যুতির বিধান। ভালভাবে নিলো না স্বার্থান্বেষী মহল, তার ঐ জাবাবদিহিতামুলক গৃহীত ব্যবস্থাকে।

(৪) খোলা বাজার থেকে অস্ত্র মুক্ত করতে নিয়েছিলেন কঠিন পদক্ষেপ; এই পদক্ষেপও মনপুত হলো না, স্বার্থান্বেষী ডাকাত দলের।

(৫) দুর্ভিক্ষের সুযোগে, বিদেশি শক্তিগুলো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুযোগ আরো প্রশস্ত করে ফেলে; তাদের পক্ষে, বিশ্বাসঘাতক

কিছু রাজনৈতিক শীর্ষ স্থানীয় নেতা ও প্রশাসনে নিযুক্ত উচ্চভিলাষী কিছু ব্যক্তিবর্গ পিছন থেকে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। এদের সবাই কে সমুচিত শাস্তি দিতে, তাঁর এহেন পদক্ষেপ যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে আপনার কাছে আমার আরো প্রশ্ন: বিশ্বে কোনো একক গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসেবে, এমন কেউ কি উদাহরণ হিসেবে আছেন? না থাকলে, আকাশচুম্বী প্রত্যাশা রাখা একক জাতীয় নেতা হিসেবে দেশকে ভালবেসে, উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে তার নেওয়া 'লি কুয়ানদের মত সিদ্ধান্ত কি, গণতন্ত্র হত্যাকারী হিসাবে বিবেচিত করা সমীচীন?

বিশ্বে কোনো জাতি প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই, সে জাতির কেউ ত্রাণকর্তা হিসাবে, খেতাব প্রাপ্ত হয়েছে কি? না হলে, তার উপর জাতির অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণ 'বঙ্গবন্ধু' নামকরণ কি তবে, সঠিক হয়নি?

বিশ্বে কোনো নজির আছে, সকল জাত, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে, তাঁরই আদেশে নিরস্ত্র এক জাতি লাঠি, বন্দুক হাতে নিয়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য, এক কথায় সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে? যদি না থাকে, তাহলে সত্যিই তো তিনি অসাধারণ। তাহলে তো দেশের জন্য যে কোন উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে, তিনি যে কোন অসাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই তো খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তি সংগত, সঠিক কি না ?

আপনার মতো লাউ-কদু গোছের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া, বা ডাক সাইটে রাজনৈতিক নেতা গোছের একটা মাথা- কোন জ্ঞানে, যুক্তিতে তাঁর মতো হিমালয় সম এক রাজনৈতিক দার্শনিকের নেয়া কর্মকাণ্ডকে সমালোচনা করতে আসেন, বা চান? ভিন্ন আদর্শের রজানীতি করেন, বলে? না তার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে'র নায্যতা যাচাই করার জন্য? না, বঙ্গবন্ধুকে খাঁটো করার কোনো উদ্দেশ্যে? এমন করলে যে, নিজেই আজ এক বিরাট হাসির পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবেন, এই প্রজ্ঞা নেই কেন, আপনার?

আপনার উর্বর মস্তিষ্কের জন্য ছোট একটি কাজ দেই। কেন বঙ্গবন্ধু, লাল-সবুজ এ বাঙালি রাষ্ট্রের জন্য- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ একই সাথে গাঁথলেন? এ রকমের মালা গাঁথা তো কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বইতে আগে লেখা ছিল না? তবে কি তার, এই নতুন পদ্ধতিতে চলতে চাওয়া, নিজ উদ্ভাবনী রাষ্ট্র তত্ত্বের জন্যেই, মুর্খের দল তাঁকে বুঝতে না পেরে, হত্যা করেছিলো?

আসলে নিজ মাটিকে ভালবাসার মানে কী, তার অর্থ জানা, বঙ্গবন্ধুকে কেউ কোন প্রশ্ন করার আগে জেনে নেওয়া, সবার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, প্রিয় ভাই-বোনরা আমার। জানলে, তারপর দেখবেন বঙ্গবন্ধুর কোনো কর্মকাণ্ডের উপর প্রশ্ন তোলা, চেতনা শক্তির বাহিরে হয়ে যাবে, ইচ্ছেটাই। আমি নিশ্চিত হবার পরই, আপনাদের সবাইকে বলতে পারছি- এ কথা।
জয় বাংলা: জয় বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিভাজ্য সত্ত্বা: এই সত্ত্বা চিরঞ্জীব থাকুক।

A Gift of Destiny

Md Shariful Hasan Khan
Assistant Director
Department of Business Administration in Finance & Banking

What's the meaning of this?
I recall sad, forgotten words
A haunting fragrance
That never drifts away?
Sweetness and that softness
Comes into my dreams
Still there are those memories
That make me fear to stay
I need a miracle to wash it all away.
Is there another kind of love?
That brightly glows with Truth & hope
The thrill of perfect destiny
With love that cannot die
Beyond the agony of sighs
I was sure love would come
I believed there was a perfect Path.
Have faith, visualize
Real love would have no pain.
But then came darkness
And such loneliness
It makes me to look beyond
To loosen all my chains.
The miracle's inside
That's where the answer reigns.
I found it all within
The brilliant light beyond myself
I felt the power
Gazing on a rocky sea
The miracle appeared
A gift of destiny.

জীবন নাটিকার রঙ্গমঞ্চ

ফাহমিন চৌধুরী তাজিম
আইডি নং: ১৮৪২১০৫২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
আইন বিভাগ

'মাস্টার্স শেষ করামাত্রই হুট করে যেন বাস্তবতা একটু বেশী করে আঁকড়ে ধরলো। বরাবরের মতই বাউন্ডুলে জীবন আমার। এই ঘুরে বেড়াই, এই চা খাই, মাঝে ক'দিন সিগারেট চলেছিল। যদিও লেখকরা যেভাবে উপস্থাপন করেছিলো এই ধূমপানটাকে, বাস্তবে ব্যাপারটা এতটাও সুখকর না। তার উপর দামটাও নেহাত বেশিই বলে মনে হয়েছে। এদিকে হাতখরচ কমানোর পরিবর্তে যখন সঞ্চয় বাড়ানোর সময় তখনও আমি নির্বিকার জীবন পার করছি। নেহাৎ দাড়ি আর চুল বড় না থাকলে, আমার এই চালচলন দেখে প্রথম বর্ষের নির্ভেজাল মানুষ বলেই চালিয়ে দিতো সবাই। আমার জীবনটা আসলে এমনই, আমি এরকমই ছন্নছাড়া হয়েই চলেছি। চাকরি-বাকরির বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল। আমার যেসব বন্ধুরা তৃতীয় বর্ষ থেকে চাকরির পড়াশুনা করছে তারা ইতোমধ্যেই অনেক জায়গায় টিকে গিয়েছে, ক'দিন পরেই জয়েন করবে নাকি শুনলাম। ওদিকে সরকারী চাকরির নেশায় মত্তরা এখনো প্রতীক্ষায় আছে যদিও দু-চারজনের প্রথমবারেই হয়ে গেছে। আমি এসবের ধারেকাছে ছিলাম না কখনো। হাতখরচটার ঘাটতি সেভাবে পড়েনি, ছোটোমামা প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর টাকা পাঠায়, কুয়েতে নাকি ভালোই উপার্জন। তবুও আমি বাসা থেকে আমার হাতখরচটা এড়িয়ে চলি। পত্রিকায় লেখালেখির বিনিময়ে যা আসে তা দিয়ে দৈনিক চার-পাঁচ কাপ চায়ের যোগান হয়েই যায়। আমি এই টিএসসির এখানে দাঁড়িয়ে প্রায়শই কবিতা আবৃতি করি। যদিও আমার বন্ধুবান্ধব কেউ শোনে না এসব, ওরা মহাব্যস্ত। এসব নিয়ে ধুদ্ধুমার কান্ড, আমাকে সমাজের নির্মিত নিয়মে বাঁধতে বদ্ধপরিকর সবাই! কিন্তু আমি তো এসব নিয়মের উর্ধ্বে।

এভাবেই দিন পার করছিলাম। ওদিকে আমার বন্ধুদের তুমুল বারণগুলো আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিলো। ওরা বুঝে গেছে আমাকে এই সমাজনির্মিত নিয়মে বাঁধা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে একদিন সবাই গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলাম। মাস্টার্সের ক্লাস তখন শুরু হবে হবে ভাব। আমি রোজকার মতই টিএসসি যাই, চা খাই, আবৃতি করি, এরপর রাতের খাবার খেয়ে গল্পানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। এরকমই একটি দিনে আমি ডায়েরি হাতে হাঁটছিলাম, রাত তখন ১২টা হবে। ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো হুট করে! টং দোকান খুঁজে যে দাঁড়াবো সেটারও অপশন পেলাম না...কোনোমতে গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম। যা গতি দেখছি তাতে মনে হচ্ছেনা ঘন্টাখানেকের মধ্যে এ বৃষ্টি থামবে...! দূরে একটা চায়ের দোকান দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, ডায়েরীটাকে শার্টের ভাজে লুকিয়েই দৌড় লাগালাম। দু'বার স্লিপ খেয়ে, হাটুপানিতে প্যান্ট ভিজিয়ে, একদম কাকভেজা হয়ে ওখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম চা দোকানী ছাড়াও আরো দুজন বসে আছে ছাতা হাতে। ছাতা দিয়ে যে এ বৃষ্টি ঠেকানো যাবেনা সেটা বুঝেছিলাম। এদিকে আমার ডায়েরি ভিজে একাকার, কোনোমতে ওটা টেবিলে রেখে মাথা ঝাড়া শুরু করলাম। এক কাপ চা অর্ডার করতে গিয়ে খেয়াল করলাম বৃষ্টি কিছুটা কমছে। ছাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেয়েটি আমার সামনে দিয়েই চলে গেলো, খুউব সম্ভবত নিজ গন্তব্যেই। কিন্তু বেশ স্নিগ্ধ সেই চেহারাটা। আচ্ছা বৃষ্টিভেজা সকল নারীদের চেহারাতেই কি এমন স্নিগ্ধতা দেখা যায়? যায়না বোধহয়, হলেও এতটাও না। ভেজা কপালে এখনো কালো টিপটা এঁটে আছে মেয়েটির। এটাই ছিল আমাদের প্রথম দেখা। ঠিক সেসময়েই চা চলে আসলো।
সেদিন চা খেয়ে আর গল্পানুসন্ধান করতে পারিনি। বৃষ্টি যখনি অনেকটা থেমেছে তখনি হাঁটা শুরু করেছি। শুনেছি এই সময়ে সিগারেট পরম আরামদায়ক। কিন্তু ওটার নেশা আমার নেই দেখে বেরিয়ে পড়লাম ছাউনি থেকে। মিনারের 'তুমি চাইলে বৃষ্টি'

গানটা মাথায়
বাজছিলো। গলা উঁচিয়ে না, গুনগুনিয়েই শুরু করলাম গানখানা। ফাঁকা রাস্তায় বেশ লাগছিলো। তার উপরে মাথায় এখনো সেই টিপপড়া স্নিগ্ধ চেহারাটা ভাসছে। বেশ লাগছে ভাবতে। কিন্তু নাম পরিচয় জানা হয়নি। সঞ্জীব এরকম অনুভূতিকে উল্লেখ করে আরেকটি গান
লিখেছিলেন,
"রিক্সা কেনো আস্তে চলেনা...
রিক্সা যাচ্ছে হাওয়ায় উড়ে
আমার হৃদয় তুচ্ছ করে..."

মেয়েটিও এভাবেই চলে গেলো। নাম পরিচয়ের সুযোগ না দিয়ে। তার সাথে আবার দেখা হওয়া চাই। তখন নামটি জেনে নিতে হবে।
পরদিন ঠিক একইসময়ে বের হলাম, একই রাস্তা,একই চায়ের দোকান। কিন্তু না আছে বৃষ্টি, না আছে মেয়েটি। তারমানে কি বৃষ্টি আর মেয়েটি একই সাথে আসে? কে জানে! হবে হয়তো।
সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। আমি রোজকার মতন কবিতা আবৃত্তি করছি আর কিছু বাচ্চা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। অবশ্য ওদের মুগ্ধতা আমার আবৃত্তিতে নাকি আবৃত্তির পরের সিঙ্গারা-চায়ের প্রতি সেটা একটা প্রশ্ন! যাকগে! তাওতো শুনছে, আজকাল তো কবিতা শুনানোই দায়।
হুট করে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো, অপরিচিতার কণ্ঠ কিন্তু বেশ মিষ্টি তার শব্দচয়ন। অস্পষ্ট যদিও। তাকিয়ে দেখি সেদিনের সেই মেয়েটা। আরেহ! কিন্তু আজ তো বৃষ্টি হচ্ছেনা, আবহাওয়াটা মেঘলা। আমার জিজ্ঞাসু চাহনী দেখেই সে বুঝল আমি তার কথা স্পষ্ট বুঝিনি।
-বলছি এভাবে সৌমিত্রের মতন আবৃত্তি না করে,নিজের মতন আবৃত্তি করলে হয় না?
এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিলনা। আমি আসলে তখন সৌমিত্রর আবৃত্তি করা দর্পন কবিরের লেখা "বসন্ত নয় অবহেলা" কবিতাটি আবৃত্তি করছিলাম। তাই হয়তো...। একটু থেমে মেয়েটি নিজেই বলে উঠলো আবার,
-এসব কেমন মিমিক্রি শোনায়, আবৃত্তিটা স্বকীয় হওয়া উচিত।
মৃণালিনীর সাথে আমার প্রথম কথোপকথনটা এভাবেই শুরু হয়েছিল।

এরপর আমাদের রোজ কথা হতো, গল্প জমতো, আবৃত্তি চর্চা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এইসব করেই দিন কেটে যাচ্ছিলো। বিপত্তিটা শুরু হলো ছোটোমামার হুট করে মরে যাওয়ার পর থেকেই। এরপর আস্তে আস্তে আশপাশটা একদম অন্ধকার হয়ে গেলো। পুরো দুটো পরিবার ভেঙে গেলো। আমি তখনো চাকরি জুটাতে পারিনি। টাকার জন্য ছুটতে ছুটতে যখন আমি নাওয়াখাওয়া ভুলে যাচ্ছি ঠিক তখনি খেয়াল করলাম, আমার সাথে মৃণালিনীর আর আগের মতন দেখা নেই, কথা নেই। সে যথেষ্ট সাহায্য করতে চাইতো আমাকে, আমিই ছন্নছাড়াভাবে এড়িয়ে গিয়েছি বারংবার। আস্তে আস্তে বুঝলাম,আমার সাথে তার সম্পর্কটা স্থায়ী না করাই শ্রেয়! বলেও ফেললাম। উত্তরের অপেক্ষা করবার শক্তি ছিলোনা, শুধু এটুকু জানতাম, ওর সামনে দাঁড়ানোর সাহসটা আমার নেই। ভাবনা চিন্তা করবার ফুসরতও নেই। বহুবার সে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমিই এড়িয়ে গিয়েছি। এরপর একসময়ে এসে সে হাল ছেড়ে দিলো।

বেশ ক'বছর পর মামার বন্ধুর মাধ্যমে বহু কষ্টে জুটেছে একাউন্টেন্টের চাকরিটা। যেদিন আমার চাকরির প্রথমদিন সেদিনই কাকতালীয়ভাবে মৃণালিনীর সাথে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিলো। অথচ মাঝে দিয়ে কেটে গেছে আটটি বছর। শুনেছি ও নাকি প্রতিবছরই এই দিনটাতে টিএসসি আসে, ওই একই জায়গায় চা খায়, হাঁটাহাঁটি করে, এরপর চলে যায়। আমি সাহস পাইনা সেথায় যাওয়ার। আমার এখন অনেক কাজ, অনেক অনেক কাজ! কবিতা লেখাও ছেড়ে দিয়েছি, যাই লিখতে যাই সেখানেই মৃণালিনী চলে আসে। আমি আজ যাই, অনেক কাজ অনেক! আরেকদিন আসব।'

এটা বলেই ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পড়লেন শাহীন ভাই। আমার হাতের চা ঠান্ডা হয়ে গেছে কখন খেয়াল করিনি। শাহীন ভাই আমার অফিসের সবচেয়ে কম কথা বলা একাউন্টেন্ট, আমার চাকরির এই ৪ বছরের জীবনে আজ প্রথম শাহীন ভাইকে এত কথা বলতে দেখলাম। জীবনের রঙ্গমঞ্চে কখন কে কীভাবে হারাবে সেটা বোধহয় সবচেয়ে রহস্যময় একটা ব্যাপার। সবচেয়ে রহস্যময়।

AIR STRIKE BY KILO FLIGHT: A TURNING POINT OF LIBERATION WAR

Group Captain A K M Ziaul Haque, BUP, afwc, psc
Director
BA/BSS Programme

1971, a year to be remembered by every Bangladeshis for years, because in this year we fought our liberation war and earned our independence. Under the great leader Bangabandhu Sheikh Mujibor Rahman all were united to achieve the goal which was freedom. The strategic directives were given on 7th March 1971, during his historical speech. On 25th March when Pakistani soldiers suddenly started killing innocent people of the then East Pakistan then along with other military, paramilitary, Police and above all general citizens of this country; the Air Force personnel also joined the liberation war. Though there was no military aircraft but still bangali officers and airmen of Pakistan Air Force fought valiantly in different land battels. Appointments like Deputy Chief of Staff, sector commander, sub-sector commander were proudly held by Air Force personnel. However, in order to gain advantage in the battel and to change the course of war absence of a separate air force were felt deeply.

During mid-August of 1971, the then defence minister of India Mr Jagjibon Ram and defence secretary KB Lal met with Prime Minister Tajuddin Ahmed and Commander in Chief Colonel Ataul Gani Osmani in Kolkata, where Deputy Chief of Staff Group Captain AK Khandaker was also present. In that meeting Group Captain AK Khandaker proposed that there are pilots, technicians who all are professional, brave and competent, if India would provide few aircraft then a separate air force of Mukti Bahini could be formed, it would enhance the morale of land forces and at the same time would bring decisive outcome in the overall war. Later on Chief of Air Staff of Indian Air Force Air Chief Marshal Pratap Chandra Lal (whose mother was from Maymenshing and wife Mrs Lila Lal was from Cumilla) played a vital role in forming a separate air force. Group Captain AK Khandaker met him as well and convinced him to provide few aircraft to Mukti Bahini.

Finally, Indian government agreed to provide 3 aircraft to Mukti Bahini as gift, though none of them were military aircraft. It was one DHC-3 Otter plane, one Alouette III helicopter and one DC-3 (Dakota, presented by maharaja of Jodhpur) transport aircraft. All three aircraft were brought to a disused airfield of Dimapur, Nagaland in mid-September. On 28th September 1971, high military officials of Indian Air Force headed by Chief of Air Staff Air Chief Marshal PC Lal came Dimapur and in presence of them Group Captain AK Khandaker declared formation of Air Force. Later, on 4th October it was named as "Kilo Flight" and the then Squadron Leader Sultan Mahmud was named as "Officer Commanding". Total 10 officers and 47 airmen formed the Kilo Flight.

It is worth mentioning that in addition to the military pilots there were bangali pilots from Pakistan International Airlines (PIA) as well who joined Kilo Flight.

Alouette III helicopter

DHC-3 otter

After formation of Kilo Flight and receiving 3 aircraft, the first duty of Officer Commanding was to prepare his team physically to undertake future challenges. At the same time it was required to modify those civil aircraft into military role. In those days with so little facilities in hand, it was a huge task to make these aircraft ready to carry out combat task. The Otter boasted 7 rockets under each of its wings and could deliver ten 25 pound bombs, which were rolled out of the aircraft by hand through a makeshift door. The Dakota was modified to carry ten 500 pound bombs, for low-level bombings. A portion of the floor was cut off and a jury-rigged devise was installed to drop the bombs on target. Near the back door of the Dakota, a bomb rack was installed to hold five 1000 pound bombs. One used to manually push them off the rack after the pilot signaled him with a bell. The Alouette III helicopter was rigged to fire 14 rockets from pylons attached to its side and had a twin-barreled .303 Browning machine gun installed underneath the main helicopter pod, in addition to having 1-inch (25 mm) steel plate welded to its floor for extra protection. Instructors from Indian Air Force trained our Bengali pilots on those aircraft. With dedication, professionalism, hard work and above all due to patriotism our pilots got conversant with the new type aircraft very quickly. It was also very important to get oriented with the surrounding area and finally technicians could successfully prepare the aircraft for combat role.

After getting ready to fight it was very important to prepare a comprehensive plan or strategy. Considering the capability of Pakistani air power and presence of threat from anti-aircraft artillery, it was decided that initial air attack will be carried out at night and hit and run strategy to be followed. Another important task was to select the targets. Our commanders in consultation with experts of Indian Air Force decided not to destroy any installation which could be used by Bangladesh in future, thus careful planning was made for selection of targets.

On 3rd December 1971 the Otter took off from Kailashahar Airport around 9pm. The Otter flew very low to avoid radar detection and reached Chittagong airport around 10pm. The Aircraft first fired two rockets to hit two fuel tanks of refinery successfully. It then made a second rocket attack on the fuel depots, which was also successful. By this time Pakistani anti-aircraft artillery came to know about the air strike and started firing at the aircraft. The Otter climbed high, and on its way

back to base it hit a ship with rockets. On the other hand, the Alouette III proceeded towards Godnail oil depot, Narayanganj. On their way to target they also flew very low, even in some cases they were flying below the electric cables of the streets. After reaching the destination the helicopter hit the fuel tanks with rockets successfully and then returned to base. It was later confirmed by the locals that 5 fuel tanks were damaged by the air strike. Subsequently, the Otter flew twelve and the Alouette seventy-seven sorties between December 4-16, 1971 about 40 of them were combat missions to attack ground targets in Sylhet, Comilla, Daudkandi and Narshigndi. The Alouette III rocketed Pakistani troops in Moulvibazar, Sylhet and many other places which influenced the land battel in our favor. The supply line of Pakistan military was hampered and destroyed in many occasions, which had great outcome on overall war.

The effect of air strike by Kilo Flight was huge, firstly by destroying the oil depot the logistic crisis of Pakistani troops increased, their mobility was hampered greatly. Oil is an essential element for smooth continuation of war, thus by attacking their oil depot Kilo Flight took the battel in favor of Mukti Bahini. Moreover, it boosted the morale of Mukti Bahini solders. This paved the path of our independence; this was a turning point of our liberation war.

Few members of Kilo Flight

These valiant freedom fighters of Kilo Flight not only turned the tide of the war through their brilliant air raids, but also immensely contributed to the development of Bangladesh's Air Force and airline services after the liberation. Their contribution will never be forgotten. Their bravery and invaluable contributions to our nation will always be remembered with respect, honour and dignity.

Source:

a. www.baf.mil.bd
b. Operation Kilo Flight:A Story of Valour; Published in www.dailystar.net on 23 August 2021.
c. www.wikipedia.org Operation_Kilo_Flight extracted on 10 September 2021

মহাযাত্রা বৃত্তান্ত

আবীর মোহাঃ শাকিব শাহীদী
আইডি নং: ২০১৩৮৯১০৪৯, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১৮নং বিমল দত্ত লেনের ছ'নম্বর বাড়িটার সামনে একটি পাগলি দাঁড়িয়ে আছে। পাগলির সাথে দু-তিন বছরের একটি বাচ্চা। বাচ্চার পরনে শুধুমাত্র একটি কাদামাখা স্যান্ডো গেঞ্জি। বাচ্চাটির গলা চিকন একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ির একপ্রান্ত পাগলির হাতে ধরা। বাচ্চার গলায় এভাবে দড়ি বাঁধার কারণ অজানা। হাঁটার সময় পাগলি ছাগলের বাচ্চার মতো দড়ি টেনে বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে। গলায় দড়ি বেঁধে এমন টানাটানি করায় বাচ্চাটিকে খুব একটা আপত্তি করতে দেখা যায় না। সবসময় তার মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। এই মুহূর্তে বাচ্চাসহ পাগলির দাঁড়িয়ে থাকার কারণ - তার প্রচন্ডরকম ক্ষুধা পেয়েছে। বাড়িটার ভেতর থেকে অনেক মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উপলক্ষে বাড়িটিতে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হওয়ার কথা। সেখানে গিয়ে একটুখানি খাবার চাইলে কি পাওয়া যাবে না? পাগলি এতোকিছু চিন্তা করতে পারছে না। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে সে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না। অনেকে বলে, পাগলদের বোধশক্তি খুব কম থাকে।

১৮নং বিমল দত্ত লেনের ছ'নম্বর বাড়িটিতে আজ কোনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। বাড়িটিতে লোক সমাগমের কারণও আনন্দময় কোনো উপলক্ষ নয়। আজ এ বাড়ির প্রধান কর্তা জনাব আলতাফুর রহমান মারা গিয়েছেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। কিছুদিন আগেই তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এরপর থেকে তিনি বাসাতেই অবসর যাপন করছিলেন। এসময় তাঁকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হতো। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শরীরের উপর দিয়ে যে ধকলটা গিয়েছে, সেটা থেকে হয়তো একটু জিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হলেও মৃত্যুর আগে তিনি অদ্ভুত কিছু কথা বলে যান। সকালে নাশতা শেষ করে তিনি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছিলেন। চায়ে চুমুক দিতে তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন বেগমের সঙ্গে হালকা কথাবার্তা বলছিলেন। ঘরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ তখন ছিলো না। হঠাৎ তিনি ডাইনিং টেবিলের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "অদ্ভুত লোক তো! ঘরের দরজা থাকতে জানালার ভেতর দিয়ে লাফ দিয়ে এসে সরাসরি টেবিলের উপর থাবা গেড়ে বসে পড়লো! অ্যাই শোনো, এই ভদ্রলোককে এক কাপ চা দাও।" এই বলে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। পড়ার আগে তাঁর মাথাটা ডাইনিং টেবিলের সঙ্গে প্রবলভাবে ঠুকে গেলো। ডাইনিং টেবিলের উপর রাখা প্লেট-গ্লাস ঝনঝন করে উঠলো। কাঁচের একটা গ্লাস টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেলো। মৃত্যুর আগে তাঁর বলে যাওয়া অদ্ভুত কথাগুলো রহস্যই থেকে গেলো।

আলতাফ সাহেব মারা গিয়েছেন সকাল আটটায়, এখন বাজে এগারোটা। এরই মধ্যে তাঁর মৃত্যুসংবাদ সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সবাই আস্তে আস্তে বাড়িটিতে আসতে শুরু করেছে। লাশ গোসল করিয়ে বাড়ির সামনে প্রকান্ড এক আমগাছের ছায়ায় রাখা হয়েছে। লাশ খাটিয়ার উপর রাখা। সোনালি সুতার কাজ করা আরবি লেখার কারুকার্যখচিত একটি কালো কাপড় দিয়ে লাশটি ঢেকে রাখা হয়েছে। একজন বৃদ্ধ লোক মুগ্ধ চোখে লাশঢাকা কাপড়টির দিকে তাকিয়ে আছেন। এইমুহূর্তে তাঁর উচিত মৃতের জন্য দুঃখিত হওয়া, এটা তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন। কিন্তু কাপড়টির সৌন্দর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আরো বেশ কিছুক্ষণ খাটিয়ার কাছে থাকার ইচ্ছা ছিলো তাঁর। কিন্তু খাটিয়ার কাছে জ্বলতে থাকা আগরবাতির ঘ্রাণে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। পেটের ভেতরেও মনে হয় পাক দিচ্ছে। তিনি খাটিয়ার কাছ থেকে চলে এলেন।

ভেতরবাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন বয়সী মহিলারা দলবেঁধে বিলাপ করে কাঁদতে বসে গিয়েছেন। ইতোমধ্যে ইসামিন বেগম কয়েকবার মূর্ছা গিয়েছেন। প্রতিবারই মাথায় পানি ঢেলে তাঁর জ্ঞান ফেরাতে হয়েছে। বাড়িতে যে শুধু বড় মানুষেরাই এসেছেন, তা নয়। কিছু ছোট ছোট শিশুকেও দেখা যাচ্ছে। মৃতবাড়ির শোক তাদেরকে স্পর্শ করছে না। বাড়িভর্তি মানুষ। তারা মহানন্দে মানুষজনের ফাঁকফোকর দিয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে। একারণে এর মধ্যে কয়েকজন তাদের মায়ের কাছে চড় খেয়েছে। চড় খেয়ে খানিকক্ষণ কেঁদেকেটে স্বাভাবিক হয়ে তারা আবার ছোটাছুটি করে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এতে কেউ কিছু মনে করছে না।

এদিকে আলতাফ সাহেবের সাবেক এক সহকর্মী এসেছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। এই ভদ্রমহিলার আবার সাজগোজের প্রতি সামান্য ঝোঁক রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে তিনি মৃতবাড়িতে এসেছেন মুখে ঘষামাজা করে। আসার খানিকক্ষণ পরেই তাঁর স্বামীকে বললেন, "এতো মানুষ এখানে! মানুষজনের গাদাগাদিতে আমার মাথা ধরে গেছে। তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেতে হবে।" একথা বলেই তিনি তাঁর স্বামীর কাছে প্রচণ্ড এক ধমক খেলেন। ভদ্রমহিলার এসব কান্ডকারখানা নিয়ে ভেতরবাড়িতে ফিসফাস হচ্ছে। ফিসফাসও ঠিক নয়, উচ্চস্বরে গুঞ্জন। এমনভাবে গুঞ্জন করা হচ্ছে, যাতে ভদ্রমহিলা নিজেও তা শুনতে পান।

এরই মধ্যে রহিমার মা উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করেছে। রহিমার মা এই বাড়িতে কাজ করে। বাড়ির কর্তার মৃত্যুতে গৃহকর্মীর এমন বাড়াবাড়ি রকমের কান্নাকাটিকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখছে। এটা নিয়েও সবার মধ্যে নিচুস্বরে কথাবার্তা হচ্ছে।

বাড়ির ভেতরের একটা রুম থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি ভেসে আসছে। বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও জীবদ্দশায় করা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপকাজের গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার একটি প্রচেষ্টা। তালেবুল ইলম মাদ্রাসার ছাত্ররা একমনে কুরআন তেলাওয়াত করে যাচ্ছে। তাদের কোনো বিরতি নেই।

এদিকে বাড়ির পুরুষ সদস্যরা আলাদাভাবে একপাশে আলোচনা করতে বসে গিয়েছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু আলতাফ সাহেবের জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা। ভদ্রলোকের নামে দেশের বাড়িতে এবং শহরে ভালো পরিমাণ জমিজমা আছে। এইসব জমির প্রতি সবারই অনেক আগ্রহ। সবাই ন্যায্যভাবে বা অন্যায্যভাবে নিজের পকেট ভারি করার চিন্তায় আছে। লাশ কবরে নেমে যাওয়ার আগেই তারা জমিজমার বিলিব্যবস্থা করার স্ট্র্যাটেজি শুরু করে দিয়েছেন। ভদ্রলোকের মৃত্যুতে তাদের চেহারায় দুঃখের চেয়ে চিন্তার ছাপ বেশি দেখা যাচ্ছে।

এখন সময় বিকেল চারটা। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আলতাফ সাহেবের জন্য খুঁড়ে রাখা কবরে বৃষ্টির পানি জমে গিয়েছে। যে ভদ্রলোক কবর খোঁড়ার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এখন সেই পানি সেঁচে বের করে ফেলার চেষ্টায় আছেন। কবরের ভেতরে কয়েকটা ব্যাঙ দেখা যাচ্ছে। তারা বিপুল উৎসাহে কবরের পানিতে লাফালাফি করছে। অনেক চেষ্টা করেও সেগুলোকে ধরা যাচ্ছে না। বেশি ঝামেলা হলে ব্যাঙসহ লাশ দাফন করা হবে, এমন চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।
আলতাফ সাহেবের জানাজার নামাজ শেষ হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঝুমবৃষ্টি না, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মাঝেই লাশ নিয়ে সবাই কবরস্থানের দিকে রওনা হয়ে গেলো। সবার পড়নে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা টুপি। বৃষ্টিতে ভেজার কারণে সেগুলো থেকে সাদা রঙের আভা বের হচ্ছে। সবাই মৃদুস্বরে দোয়া-দরূদ পড়ছে। কয়েকজন দোয়া-দরূদ পড়তে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শুভ্র আভা, ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ, সম্মিলিত কণ্ঠের গুনগুন শব্দ - সবমিলিয়ে সেখানে একটা অপার্থিব অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো০।

একজন মানুষের মৃত্যুর সাথে অনেকগুলো গল্প জড়িয়ে থাকে। হারানোর গল্প, বেদনার গল্প, কান্নার গল্প এবং অনেকগুলো মানুষের স্বার্থের গল্প। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাওয়া মানুষটি কি এই গল্পগুলো জানতে পারেন? বলাটা কঠিন। কারণ মানুষটি এখন আর পৃথিবীর মোহের বন্ধনে আবদ্ধ নন। তাঁর যাত্রা এখন অন্য এক ভুবনে। তাঁর মহাযাত্রার গন্তব্য এখন অসীমে!

Soliloquy of a Chess Pawn

Azharul Islam
ID: 19411062, Session: 2018-19
Department of International Relations

The sword in my hand dazzled due to the glimmering rays of the morning sun falling on to it. I squinted at the tall figure behind me, which was adorned with snow-white robes and crowned majestically. She had the kind of face that showed calmness; yet firmness. Before I could admire more of her majesty, the bangs and booms made me look back and there they were! The black pawns in their usual dark attire roared and charged and so did we.

As the other pawn rushed past me, I stayed back and thought most unlikely of things that a pawn could think of in the middle of a war; my life! For being pawns, we are the ones to stand in the first line and quite befittingly, we are the ones to go down first. We are referred as the rabbles and we fall so that the ones with the ranks may survive. My role as a self-pacifier couldn't long last as the blood chilling scream tore the already torn silence of the battle field. The pawn that just fought beside me no longer existed, and, to my horror, I realized that for the first time in my life I was face to face with one of the dark knights, famous for their atrocity whereas I was abused for my tameness. His black cape cast a dark shadow upon my face as well as on my life. I closed my eyes because I knew it was over. The knight drew his sword while I drew my last breath. Seconds later, a violent gust shook me ahead to be followed by a hissing slash. There stood before me the snow-white queen with her robe flying in midair and her sward; she pierced the knight's soul. If it hadn't been for the queen, I would have been dead. It was a far better deal than living this wretched life of mine.

I chose to proceed, at last; lurking around in between raging soldiers was quite an inappropriate thing to do. The air was getting heavier. Slash cut bang-boom! Everywhere I looked, death had taken its toll. It was as if the reaper himself had descended on earth. The last take of my short spanned drama was about to brew …

A wail of despair rose from somewhere in the grounds. Every eyes on the field watched as the white robe in no time became red, soaked with blood. One of the unwritten rules of our war was, Queen's death meant the end of war. If not literally then morally. And then it struck me! When you have come too far in a tunnel and there is no way out, the only thing you can do is to proceed because light is always there at the end. For the second time in my life, I, the tamest soldier chose to march on. I took cover, dodged, crawled but somehow kept going. And when the sun was about to set I had reached the enemy line. The pride that swept over me was overwhelming. I looked back and realized that this was the longest journey I had ever made. There was only one step, and I would be baptized. This was going to be a history; a slave becoming the Conqueror. And finally, I took the step. The sword in the pawn's hand glared from the glimmering rays of the morning sun. The pawn squinted at the tall figure behind him. It was I who was adorned in snow white robes and crowned majestically.

কল্পনায় হুমায়ুন আহমেদ

মো. মুঈন রিদওয়ান চিশতী
আইডি নং: ২০২৩০১১০৪৬, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন জেনারেল বিভাগ

জানালার পাশে ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসে হুমায়ুন আহমেদ স্যার এর "মাতাল হাওয়া" বইটি পড়ছিলাম। শেষ পাতাটা পড়া শেষ করে বন্ধ করলাম বইটা। কালো প্রচ্ছদটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রিয় চরিত্র হাসান রাজার মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। কেমন একটা বিষণ্ণতা ভর করলো মনে .....

'কী ভাবছো এত গভীরভাবে?'

বাসায় প্রাণি বলতে আমি একাই ছিলাম। তাই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। মধ্য বয়স্ক এক ব্যক্তি পা তুলে আমার খাটে বসে আছেন। তাঁর পরনে হালকা নীল ফতুয়া। মাথায় একটা সাদা হ্যাট, চশমার ভারী গ্লাসের আড়ালে জিজ্ঞাসু চোখ দুটি উঁকি দিচ্ছে। মনে হলো এই ব্যক্তি আমার বহুদিনের চেনা; কিন্তু এই মুহূর্তে চিনতে পারছি না। হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে ইনি তো স্বয়ং হুমায়ুন আহমেদ স্যার। তিনি এবার বললেন,

'কী ব্যাপার? এমন হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন? চিনতে পারোনি?'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে বললাম,

'জ্বি স্যার, চিনেছি। কিন্তু, স্যার আ-আ-আপনি?'

'কেন? আমি আসতে পারি না? নাকি মরে গেছি বলে, দেখা হওয়া নিষিদ্ধ?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'না- না- ছি! ছি! তা হবে কেন? কিন্তু, এটা তো সম্ভব না ।'

'কোনটা?' হুমায়ুন স্যারের ভ্রু কুচকে গেল ।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই যে, আপনি এখানে! বাস্তবে তো এ অসম্ভব! '

'সবকিছুকে বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে কেন? পৃথিবীর সব রহস্য কী উদ্ধার হয়ে গেছে?'

'না।'

'ধরে নাও, আমিও সে রকমই একটা রহস্যের অংশ।'

' জ্বি স্যার।' একটু থেমে বললাম, ' স্যার, কোনটা আনবো আপনার জন্য? চা নাকি কফি?'

ঘর ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন হুমায়ুন স্যার । হাসতে হাসতেই বললেন, 'এত বই পড়ো আমার, অথচ জানো না আমার কী পছন্দ?'

লজ্জা পেয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি বসুন। আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'চা বানাতে হবে না । খেতে ইচ্ছে করছে না ।'

.... কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম ।...

হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, ' স্যার, মাতাল হাওয়া বইটায় আপনি হাসান রাজাকে মেরে ফেললেন কেন?'

হুমায়ুন স্যার বললেন, 'বাস্তবে এমনই ঘটতো।'

'হাসান রাজা বাস্তব জীবনের কোনো চরিত্র হলে তার মৃত্যুদণ্ডই হতো ।'

'কিন্তু স্যার আপনিই বলেছেন- সবকিছু বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে কেন ?'

হুমায়ুন স্যার কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, ' তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।'
দুজনেই নিঃশব্দে বসে রইলাম।
হঠাৎ হুমায়ুন স্যার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি যাবো।'
আমি বললাম, 'স্যার, একটা অনুরোধ...'
হুমায়ুন স্যার হেসে বললেন, ' বুঝেছি। দাও। অটোগ্রাফের ডায়েরিটা দাও।
আমি ডায়েরিটা এগিয়ে দিলাম। স্যার কিছু একটা লিখলেন ওতে।
ডায়েরিটা বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এবার বন্ধ করো চোখটা।'
আমি চোখ বন্ধ করলাম .....
হঠাৎ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম ইজিচেয়ারে । তাহলে কি আমি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? তার মানে হুমায়ুন আহমেদ স্যার আসলে আমার স্বপ্নে এসেছিলেন? এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে চোখ পড়লো মেঝের দিকে। সেই অটোগ্রাফের ডায়েরিটা পড়ে রয়েছে। তুলে নিলাম ওটা।
কী ভেবে যেন শেষ পৃষ্ঠাটা খুললাম। সেখানে লেখা -
"সব রহস্য ভাঙতে নেই। কিছু রহস্যকে তার মতোই থাকতে দাও।"
তার নিচেই নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের সেই অটোগ্রাফ।

[গল্পের কাল্পনিকতা ফুটিয়ে তুলতে হুমায়ুন আহমেদের "মাতাল হাওয়া" বইটির চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে।]

অন্তপারের ভাবনা

আব্দুল্লাহ আল মাদানী
আইডি নং: ১৮১২১০২৯, শিক্ষাবর্ষ- ২০১৮-১৯
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

ক্যাম্পাস বন্ধ প্রায় দেড় বছর। বাড়িতে বসেই পড়ছি, ক্লাস করছি, পরীক্ষা দিচ্ছি। এই জিনিসটা একটা নমুনা যে আমরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে কতদূর এগিয়ে গেছি। বিজ্ঞান কোথায় নিয়ে গেছে আমাদের। আমি নোয়াখালীতে বসে আছি যেটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'শ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে। আমি এতো দূরে বসে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করছি, পরীক্ষা দিচ্ছি। আবার এই বঙ্গ দেশে বসে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তের হাজার মাইল দূরে অন্য কোনো দেশের ক্লাসেও তো অংশগ্রহণ করা যাচ্ছে। আমাদের বাবা চাচারা ওনাদের সময়ে এসব কল্পনাতেও আনতে পারতেন কী না আল্লাহ মালুম। যাইহোক, মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। সুযোগ পেলে বিকেলে বের হই বন্ধুদের নিয়ে। এলাকায় ঘুরি। মানুষের সাথে কথা বলি। কোনো ভিতরিয়া চা দোকানে বসে দোকানীর সাথে গল্প করি। নিজের পরিচয় দিই, তার পরিচয় নিই। দোকানীও অবাক হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ভাতিজা, আমরা একই এলাকার মানুষ, অথচ একজন আরেকজনকে চিনি না। নিজের এলাকারই মানুষ, দেখলে মনে হয় অন্য কোনো এলাকা থেকে এসেছে। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যায় তার বাবাকে চিনি, চাচাকে চিনি, দাদাকে চিনি। কিন্তু তাকে চিনি না"। এই যে জেনারেশান-গ্যাপ, এটার একটা খারাপ পরিণতি আছে। সামাজিক বন্ধনগুলা ঢিলে হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। এটা কেবলই যে একটা নিছক "সামাজিক সম্পর্কের" ব্যাপার- তা নয়। একটা জাতির মৌলিক অস্তিত্বও এর সাথে জড়িত।

বাবা চাচার সাথে, বাড়ির কোনো প্রবীণ আত্মীয়ের সাথে গল্পে বসলে একটা বিষয় অবাক হয়ে খেয়াল করি, ওনারা নিজ গ্রাম ছাড়াও তিন পাঁচ গ্রাম পরের মানুষদেরও চিনতেন, তাদের হাড্ডিপাত্তিলসহ। আর আমরা এখন ঘরের পাশের মানুষদেরও চিনিনা। কাজী নজরুল ইসলাম তার একটা প্রবন্ধে লিখেছেন "আমরা এখন আমাদের প্রতিবেশীদের না চিনতে পেরে গর্ব করি"। বাবা চাচারা গল্প করেন- ওনাদের সময়ে দুই ঈদে বাড়ির বড়রা সবাই একসাথে হতেন। বিশাল মজমা বসতো বাড়ির বড় উঠোনে। একসাথে সেমাই-চিনি, রুটি-মাংশের উৎসব করতেন। বাড়ির টুকটাক সমস্যাগুলো নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে মিটমাট করতেন। এই সময়ে এসব শুনে রূপকথা মনে হয়। আসলেই কী ছিলো এমন! এলাকায় কোনো একটা সমস্যা হলে মুরুব্বীরা পঞ্চায়েত ডাকতেন। সমাধা করে দিতেন। একটা শৃঙ্খল ছিলো। এখন সমস্যা হলে কেউ সমাধান নিয়ে আর এগিয়ে যায় না। পঞ্চায়েত প্রথাতো উঠিয়েই নেয়া হয়েছে। কোনো কিছু হলেই মারামারি, হাঙ্গামা। সম্পর্কগুলোও শেষ। নজরুল উপরের কথাগুলো বলেছেন তার সময়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝির দিকে। এখন বেঁচে থাকলে হয়তো সূর্যের আলোতেও হাজার বোল্টের লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বের হতেন- "আমার সম্পর্করা কোথায়?"

এ-তো গেলো গ্রামাঞ্চলের কথা, যেখানে সামাজিক বন্ধন সচরাচর মজবুত হয়ে থাকে। শহরের অবস্থা কী তাহলে? বলি, শুনুন। ভার্সিটির প্রথম বর্ষে, ঢাকায়ও মোটামুটি নতুন তখন। মেস পাল্টাবো। ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ পুরাতন বাসা ছেড়ে নতুন বাসার গেইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখলাম গেইটে তালা। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কেউ নামে কী না। ঘন্টা তিনেক দাঁড়িয়েও কারো ছায়া দেখিনি। পাশের বিল্ডিংয়ের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম নাম্বার আছে কী না, চিনেন কী না? আচ্ছা, দারোয়ান নাও চিনতে পারে। বিল্ডিংয়ের মালিকের দেখা পেলে তাকেও জিজ্ঞেস করলাম- হয়তো ওনার কাছে থাকতে পারে। বিল্ডিং মালিক বিল্ডিং মালিককে চিনবে, যোগাযোগ থাকবে। কিন্তু না, তিনিও হতাশ করলেন। নাম্বার নেই, চিনেনও না। ভয়াবহতা

ভয়াবহতা আঁচ করতে পারছেন না? এই লেখাটা যেদিন লিখছিলাম, সেদিন প্রথম আলোর একটা পুরনো লেখা পড়েছি। একজন মহিলা- ধরুন তার নাম রিনা আলম- তিনি তার পাশের বিল্ডিং থেকে বিয়ের দাওয়াত পেয়েছেন। কিন্তু তার মেজবানকে চিনেন না তিনি, এমনকি কোনোদিন আলাপ পর্যন্তও হয়নি। পরে বিয়েতে যাননি এই ভয়ে যে, পরে না জানি কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এটাতো পাশের বিল্ডিংয়ের অবস্থা। নিজ বিল্ডিং? আরেকজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক- ধরুন তারা নাম আনিস পারভেজ। তার বিল্ডিংয়ে ৪৮টি পরিবারের বসবাস। দুয়েকজন ছাড়া তিনি ঐ বিল্ডিংএর আর কাউকে চিনেননা। পথে দেখা হলে বলতে পারবেননা যে ইনি আমার বিল্ডিংয়ের বাসিন্দা। প্রতিটি বিল্ডিং-এ খোঁজ নিলে মোটামুটি এমন অবস্থাই পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে আসছে। পারস্পরিক প্রয়োজনে একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক চেনা, জানা-শোনা মানুষের প্রাকৃতিক। এটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে- হৃদ্যতায়, শরীরে। ঢাকা শহরে এমনিতেই প্রাণ-প্রকৃতি নেই। ইট-কনক্রিটের বিশাল বিশাল দালানের মাঝে সেসব আজ জাদুঘরে রাখা কোনো এ্যান্টিক। একটু আধটু জানাশোনা না থাকলে এক কোটি আশি লাখ মানুষের এই শহর কিছুদিন পর আরো প্রাণহীন হয়ে যাবে। অন্তত নিজ নিরাপত্তার খাতিরেও পারস্পরিক জানাশোনা প্রয়োজন। উনিশ সালের শেষের দিকে যখন ছেলেধরার হাইপ উঠেছিলো, বাড্ডায় চার বছরের শিশুর মাকে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিলো। আমি তখন মোহাম্মদপুরে থাকি। ভার্সিটি, টুশন শেষ করে যেদিন বাসায় তাড়াতাড়ি পৌছাতাম, সেদিন আসরের পর হয়ে যেতো। ঐ সময়টাতে আমাদের বাসার সামনে একটা ছোট মেয়ে খেলাধুলা করতো। আমাকে দেখে মাঝে মাঝে দৌড়ে আসতো, এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরতো। ওরও বয়স তিন বছর হবে হয় তো। আমার খুব ইচ্ছে করতো কোলে নিয়ে একটু আদর করি, ওর ফোকলা গালটা একটু টিপে দিই। কিন্তু ভয়ে কোলে নিতাম না। আমারও মারা পড়ার আশঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

ঢাকা শহরের আশি ভাগের বেশি মানুষ স্থানীয় না। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষ এখানে বসবাস করছে। এই আশি ভাগ মানুষের বেশির ভাগেরই আবার যেখানে থাকা হয়, সেখানকার মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে উঠে না। এদের আবার নিজ এলাকার স্বজনদের সাথেও যোগাযোগের অভাবে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। ফলে ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থাকলেও কেমন যেন একটা বড় কোনো কিছুর অভাব। সেটা "সম্পর্ক"। সম্পর্ক মানুষের আত্মার খাবার। এটা টাকা-পয়সা দিয়ে পোষানো যায় না। সম্পর্ক যেগুলা হয়, সেগুলাও আবার কর্পোরেট টাইপের। প্রাণ থাকে না। মেশিনের মতো মানুষ কেবল টাকার পেছনে ছুটছে। ক্যারিয়ার, ভালো জব, একটা স্মুদ লিভিং। আহ! এসবের যাঁতাকলে সম্পর্কগুলার আর্তনাদ আর কানে যায় না। একই বাসায়, একই ছাদের নিচে থাকে অথচ সপ্তাহে দুয়েকবার দেখা হয়। একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া হয় কদাচিৎ। আমার এক বন্ধু বলেছিলো, ওর আম্মুর সাথে ওর সপ্তাহে একবার দেখা হয়। খাওয়া-দাওয়া যে যার মতো করে নেয়। কবে একসাথে বসে খাওয়া হয়েছে ওর মনে নেই।

বিজ্ঞানের এই বিপ্লবের যুগে মানুষের যোগাযোগের দূরত্ব কমেছে। এই যোগাযোগের দূরত্ব যেই হারে কমেছে, তার শতগুণ বেশি হারে বেড়েছে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা আর হৃদ্যতার দূরত্ব। পরিবর্তন জরুরি, সমাজ পরিবর্তনশীল- এটা যেমন সত্যি। তেমনি এটা আরো বেশি সত্যি যে, পরিবর্তনের তাড়নায় যদি মানুষ তার প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায়, মূল্যবোধ, মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে তাহলে সেটা আর পরিবর্তন হয় না। বরং তার ধ্বংসই ডেকে আনে। শহরে মানুষের পরিবর্তন জীবন্তভাবে দেখা যায়। আমি ঢাকায় থাকলে সেটা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। মাঝে মাঝে কানও পেতে দিই: ভালোবাসার, আন্তরিকতার কান্না শুনি। ইচ্ছে করে ভালোবাসার গাছের গোড়ায় নিয়ম করে পানি ঢালি, যদি সতেজ করা যায়। ইচ্ছে করে বিকেলের সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নির্ভয়ে কোলে নিয়ে আদর করে হাতের মুঠোয় কদমের কয়েকটা পাপড়ি ভরে দিই। আর ও মুগ্ধ হয়ে সেই ভালোবাসার, আদরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করুক। ফোকলা গালে মুচকি হেঁসে দিক, ভালোবাসারাও হেঁসে উঠুক ওর সাথে।

Rage

Sumaiya Mehreen Meem
ID: 19141007, Session: 2018-19
Department of Economics

Look at you
Rage
Even before the match is lit you ignite and burn yourself so bright
Or is it you who blow things out of proportions for the smallest flaws?
I'm like a drum
Easy to hit on
Or easy to spit on?
You seem to be so obsessed
Am I that good that you cling on?
After I ignore, you start to beat on
Oh no! Is that how truth becomes the lie, the lie becomes the truth?
Suddenly you're morally perfect, flawless, and shrewd
Your mocking, you think, is revolutionary
Your eyes filled with rage
Well, this isn't rage, you're just a human waste

Isn't rage an actual emotion?
A pure one that we need? Our history itself is a proof
But your rage? Doesn't change the world nor our history
You're simply killing, it's fool-proof
It's as if anger rules the world, you can't live without
Was that necessary? All those words you typed out?

You say
"What's the big deal about getting some hate?
You deserve it
It's the cost of being YOU
Try me in your place I'd be able to deal with all of that
So don't whine about it

I thought you knew"
Go on, justify the hate
It's your mayhem
Your anger devalues actual anger
I clear my throat
Ahem

Do you even realize you're consuming yourself with the negativity?
Like a wild held in captivity
Your actions became someone's hurt
Your words became someone's despair
Your instant became someone's minute
Your anger became someone's life
Is that fair?!

So I rage
I'm angry
I'm angry at the anger that contains malice
I'm angry at the anger that needs to be put off
In your eyes, the red always flashes
So please just keep burning
Keep burning until you're nothing but ashe

Close the doors

Tanjila Akter Mim
ID: 2042951036, Session: 2019-20
Department of Law

Close the doors close the doors
Don't you dare make much noise
Knives and guns and needle stitches
Have you got any choice?

Sleep and dream and sleep again
They make monsters out of boys
If you stay awake and listen close
You can hear the fools rejoice.
Blood and bones and letters lovely
Sculptures that we avoid
Careful strokes of bullets in sand
Screams too heavy for your voice.

A game of cards, of love and luck
Tears are wagered instead of coins
A hope, a dream, a world pristine
Your flag lies torn on doors destroyed.

ডুব সাঁতারে জলাতঙ্ক

সুরভী আক্তার
আইডি নং: ২০১৬৯৪১০০২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ

সবেমাত্র দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠেছি। এ সময় একদিন বাসায় ছোট কাকা এলো। উনি এলে আমাদের দুই ভাই বোনের আনন্দের সীমা থাকতো না। কারণটা হচ্ছে রাতের খাবারের পর সবাই মিলে জমিয়ে ভূতের গল্পের আসর বসানো। ছোট কাকা চমৎকার করে এমন সব ভূতের গল্প বলতেন যে আমরা একাকী ওয়াশরুমে যেতেও ভয় পেতাম। মাও আমাদের আড্ডায় থাকতেন। তো যা বলছিলাম, এবার আমি বায়না ধরলাম উনার সাথে গ্রামের বাড়িতে যাব। মা কিছুতেই রাজি না। কারণ মা কখনও আমাদের একলা ছাড়তেন না। আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি সাধারণত বাবা ও মার সাথেই যেতাম। আমাদের গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলায়। বরিশাল সদরেই আমার নানা ও দাদার বাড়ি। শেষ পর্যন্ত অনেক আবদার ও অনুরোধের পর মা রাজি হলেন। কাকার সাথে আমি ও আমার ফুফাত এক বোন দাদার বাড়ি গেলাম একদিন পর।

আমি গ্রাম খুবই পছন্দ করি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। প্রচুর গাছপালা, পাখি-নদী আর বিশেষ করে মাটির সোঁদা গন্ধ আমাকে সর্বদা বিমুগ্ধ করে।

নানার বাড়িতে নদীটি একেবারেই নিকটে ছিল। আমরা বছরে একবার গ্রামের বাড়ি যেতাম এবং প্রতিদিনিই নদীতে গোসল করতাম। সাঁতার শেখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। কলসী নিয়েও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খুব একটা সফল হইনি। কারণটা হলো, আমরা চার-পাঁচ দিন থাকতাম। সে সময়টা সাঁতার শেখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আর যাও বা শিখতাম তা শহরে এসে ভুলে যেতাম। তবে একেবারেই যে কিছু শেখা হয়নি তা কিন্তু নয়। কিছুটা শিখেছিলাম। সেই কিছুটা কি? সেটা হলো ভেসে থাকা। আমি কিছুক্ষণ পানিতে ভেসে থাকতাম পারতাম। শেখার মধ্যে এতটুকুই। তবে এই এতটুকুই যে আমার জীবনে কত বড় হয়ে দেখা দিতে পারে, আমি এবার আপনাদের সেই গল্পটাই বলতে যাচ্ছি।

কাকার সাথে পরদিন দাদার বাড়িতে রওনা হলাম। আমি সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলাম। এর প্রধান কারণ ছিল নদীতে নেমে সাঁতার কাটা। দাদার বাড়ির নদীটা ছিল বেশ কিছুটা দূরে। সেজন্য ঐ নদীতে আমরা কখনো গোসল করতে যেতাম না। নানা ও দাদার বাড়ির দুটি নদীই ছিল কীর্তনখোলা নদীর, শাখা নদী। নানার বাড়ির নদীটি ছিল আমার পরিচিত আর দাদার বাড়ির নদীটি ছিল একেবারেই অপরিচিত। নানার বাড়ির নদীটি ছিল অনেকটা সমুদ্রের মহী সোপান-ঢাল-এর মতো। তীর থেকে ধাপে-ধাপে নদী গভীরতার দিকে চলে গিয়েছিল। যেহেতু আমি সাঁতার জানতাম না, আমি আমার গলা সমান পানিতে নেমে ডুব দিতাম, হাত-পা ছুঁড়তাম, সাঁতারের চেষ্টা করতাম আর অল্পক্ষণ ভেসে থাকতাম। এভাবেই গোসলটা সেরে নিতাম। আর নদীতে কোন গর্ত বা কোন খাদ ছিল না, যার জন্য কখনও কোনোদিন বিপদে পড়তে হয়নি।

যাই হোক, গ্রামে পৌঁছানোর একদিন পর আমার এক বোনকে নিয়ে দাদার বাড়ির দূরের নদীতে শখের নাওয়া নাইতে গেলাম। দুপুরবেলা কোন লোকই ছিল না তখন নদীতে। আমি কোমর সমান পানিতে নামলাম। নাহ্! আরেকটু নামি। বুক সমান নামলাম। দূর! গলা সমান না নামলে কি হয়? আরেকটু নামি। ধুপ! একি! আমিতো পানিতে তলিয়ে গেলাম। আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি তলিয়ে গেলাম কেন? এর কারণ ছিল, গলা পর্যন্ত পানিতে নামতে গিয়ে আমি প্রকান্ড একটা গর্তে পড়ে

গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমি মরতে বসেছি। আমি জানি না আমার ফুফাতো বোন বুঝতে পেরেছিল কিনা যে আমি ডুবে গিয়েছি। এখন কি করবো? যাই হোক, সাহস হারালাম না। চিন্তা করলাম বাঁচার জন্য কি করা যায়? মুহূর্তেই নিজের শরীরটা ভাসিয়ে দিলাম। চেষ্টা করলাম ভাসমান শরীরটাকে তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে আর বার বার পা দিয়ে গলা সমান পানির নীচে মাটির ঠাঁইটি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলাম। হ্যাঁ, সফল হলাম। পেলাম ঠাঁই। তাড়াতাড়ি নদী থেকে উঠে এলাম। আল্লাহ্‌র কাছে মনে মনে শোকরানা আদায় করলাম।

বাংলাদেশে প্রতি বছর শত শত শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী পানিতে ডুবে মারা যায় সাঁতার জানা সত্ত্বেও। নদী পথে চলাচলের সময় হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সকলের সাঁতার শেখা উচিত।

পরিশেষে, উক্ত ঘটনার পর আমি আজ পর্যন্ত কোন পুকুর বা নদীতে নামিনি। এমনকি সমুদ্রেও শুধু দু'পায়ের পাতা ভিজিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করি। পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ঙ্কর স্মৃতি এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা যে আমার রয়ে গেছে।

লোকসংস্কৃতি ও কতিপয় লোকচিত্রকলা: বৃহত্তর খুলনা প্রসঙ্গ

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোকচিত্রকলা। প্রাচীনকাল থেকেই লোকচিত্রকলার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তা আজও গ্রাম বাংলার মানুষের আচার অনুষ্ঠানে টিকে আছে। এগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের সজীব সুন্দর মনের সৃজনশীলতায় জন্মলাভ করেছে। অধ্যাপক নিসার উদ্দিন বলেছেন, "জীবনযাপনে নানা সামগ্রী প্রয়োজন। গ্রামের লোকেরা জীবনের বাস্তব চাহিদার তাগিদে তৈরি করে প্রয়োজনীয় নানান সামগ্রী। তারা তা করে যথাসম্ভব সুন্দর করে, দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করে। এলক্ষ্যে তারা ওই সব সামগ্রীকে রঙের শিল্পকর্মের মাধ্যমে সুন্দর বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা নকশা ফুটিয়ে তোলে। তাদের এই কর্মই হলো লোক চিত্রকলা।"

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো বৃহত্তর খুলনা জেলায় নানান ধরনের লোকচিত্রকলার প্রচলন আছে। নিম্নে বৃহত্তর খুলনা জেলার কতিপয় লোকচিত্রকলার পরিচয় তুলে ধরা হলো:

নকশি পাখা:

বৃহত্তর খুলনা জেলার সব স্থানেই নকশি পাখার প্রচলন আছে। গ্রীষ্মকালে বাতাস পাওয়ার জন্য পাখার ব্যবহার করা হয়। পাখা ব্যবহারিক জীবনে স্থূল ও বাস্তব উদ্দেশ্যের সাধন হলেও নির্মাণকালে যেমন তেমনভাবেই তৈরি করা হয় না। চোখ জুড়ানো নানা চিত্রে শোভিত করে তোলা হয়। পাখায় সাধারণতঃ ফুল, লতা, পাঁতা, গাছ, চাঁদতারা, পাখি, মানুষ, হাতি, বাংলা হরফ ইত্যাদি চিত্রকলা ফুটিয়ে তোলা হয়। তবে হাত পাখার স্বল্প পরিসরে বিচিত্র চিত্রের সমাবেশ করা সম্ভব হয় না। চিত্র রূপের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কয়েক প্রকার নকশি পাখার নাম পাওয়া যায়। যেমন ভালোবাসা কাকইর জালা, গুয়াপাতা, পালংপোষ, সুজনি ফুল, বলদের চোখ, শংক লাতা, কাঞ্চনমালা, ছিটাফুল, তারা দুল, মন বিলাসী, মন বাহার, বাঘ বন্দি, ষোল কড়ির ঘর, মন সুন্দরী লেখা, সাগরদীঘি, হাতি, ফুল ও মানুষ ইত্যাদি।

নকশি পাখা সাধারণত সুতা, বাঁশ ও বেত দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। সুতা দ্বারা তৈরি হয় শৃংখলতা, সজনিফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি প্রভৃতি নামের পাখা। আর বেত দ্বারা তৈরি হয় পালংপোষ, পাশার দান প্রভৃতি নামের পাখা। নকশি পাখা তৈরির উপকরনের মধ্যে রয়েছে সুতা, বাঁশ, বেত, তালপাতা ও শন। ময়ূরের পাখা, চন্দন কাঠের পাখা প্রভৃতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ময়ূরের পালক দেখতে খুবই সুন্দর, এতে কোন নকশার প্রয়োজন হয় না। ঘর সাজানোর জন্য ময়ূর পাখা ব্যবহার হয়ে থাকে। সুগন্ধি চন্দন পাখাতেও নকশায় আকার নেই। চন্দনের ছোবড়াগুলোকে গুছিয়ে পাখার আকারে বাধা হয়। একটি আস্ত শুকানো তালপাতা বা নারকেল পাতা খিল খিল ছড়িয়ে নিয়ে যখন বুনা হয় তখন নকশা তৈরি হয়ে থাকে । সুপারীর খোলের নকশি পাখাও তৈরি করা হয়। এছাড়া বৃহত্তর খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে আরো পাখার প্রচলন আছে।

নকশি পাখায় রঙের বৈচিত্র্য আছে। রঙের ব্যবহার সর্বত্র বস্তুকল্প নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের সাথে মিল রেখে রঙের ব্যবহার করা হয়। পালন ও মোষ পাখায় হলুদ ও সবুজ রঙের বেত ব্যবহার করা হয়। এপাখায় গাছের সজীবতা সবুজ রঙের ছাপ পড়ে। পাখার জমিন হলুদ রঙের। অন্যান্য পাখার রঙের ব্যবহারের দ্বারা বস্তুকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে রঙ সুদৃশ্য বেশি করা হয়। শৃংখলতা পাখায় সাদা, লাল, নীল ও সবুজের মিশ্রণে তৈরি করা হয়। আবার গুয়াপাতা পাখায় লাল সবুজ ও হলুদের মিশ্রণ থাকে। বস্তুত এতে আসল রূপ ধরা পড়ে না।

পাখায় রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। নকশি পাখা তৈরিতে গ্রামের শিল্পীর রুচির ওপর নির্ভর করে।

নকশি পাখা নিয়ে গ্রাম্য কবিরা অনেক গান রচনা করেছেন। তাছাড়া খুলনা জেলার একটি মেয়েলিগীতি নকশি পাখার কথা পাওয়া যায়। যেমন-

'সেই না পাখাতে লেখিয়া দিলামরে
আমার মনে কথা রে,
সেই না পাখাতে বাতাস লইতে
আমারে মনে করিওরে।'

নকশি পিঠা:

বৃহত্তর খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র পিঠার প্রচলন আছে। পিঠা তৈরির মূল উপাদান হলো আতপ চালের আটা। আটার সাথে চালের গোলা মিশিয়ে তাল পিঠা, খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে তার সাথে চিতই পিঠা ভিজিয়ে রস চিতই পিঠা, গুড় মিশিয়ে গুড় পিঠা, আবার তেলে ভেজে তেলই পিঠা ও বাষ্পে সিদ্ধ করে ভাঁপা পিঠা তৈরি করা হয়। সব পিঠায় নকশা করা হয় না। সাধারণত পুলি পিঠা ও তেলই পিঠায় নকশা করা হয়। চালের গুড়ি কাইকে বেলনা দিয়ে বেলে প্রথমে পুরু রুটি তৈরি করা হয়। তার ওপর খেজুর কাঁটা, পাটকাটি ও সুঁচ দিয়ে নকশা আঁকা হয়। আঁকার কাজ শেষ হলে বাঁশের ছিলকা বা মুছনা দিয়ে নকশার বাইরের অংশ কেটে ফেলা হয়। সুঁচ কাটা বা কাঠির দ্বারা রুটির গায়ে দাগ কেটে নকশা তোলা হয়।

নকশি পিঠায় সাধারণ ফল, পাতা, মাছ, গাছ, ঘর সংসারের সাজ সরঞ্জাম আঁকা হয়ে থাকে। পিঠার আকৃতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন কাজলতা, শংখলতা, হিজলপাড়া, সজনে পাতা, চিরল পাতা, বেটফুল, উড়িফুল, কন্যামুখ, চম্পাবর, জামাই মুচড়া, সতীন মুটমুড়ো, সরপুস, পদ্মদিঘিল, সাগরদীঘি প্রভৃতি।

বৃহত্তর খুলনা জেলার বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েরা নানা রকম নকশি পিঠা তৈরি করে থাকেন। যেমন নবান্ন উৎসবে পুলিপিঠা তৈরি করে হিন্দু গৃহিণীরা লক্ষী দেবীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দিয়ে থাকেন। আবার মুসলিম সমাজে বিবাহ ও ঈদ উৎসবে নানা নকশি পিঠা তৈরি হয়ে থাকে। জেলার অঞ্চল ভেদে এসব পিঠার বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন চালপিঠা, দুধপিঠা, বড়াপিঠা, পাঁচপিঠা প্রভৃতি। খুলনা জেলার অনেক গ্রামে কন্যা স্বামীঘরে প্রথম যাবারকালে পিঠা পাঠানো হয়।

খুলনা জেলায় শুধু পিঠা নয় আমসত্ত্ব ও খেজুরের গুড়ের পাঠালী চিত্রিত আকারে তৈরি করা হয়। এগুলো খোদিত ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হয়। ছাঁচে তৈরি মিছরির মঠে ময়ূর পরী ছবি দেখানো হয়।

নকশি পিঠার আয়ু ক্ষণিক। তবুও আমাদের রসনা তৃপ্ত করে। নকশি পিঠায় ছড়িয়ে থাকে গ্রাম বাংলায় নারী মানসের রূপ। এরূপের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলে তারা অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যবোধ ও সুচারু বৃত্তির পরিচয়। নকশি পিঠা নিয়ে গ্রামের মানুষ গানও রচনা করেছেন। একটি গ্রাম্য মেয়েলিগীতে আছে।

'কন্যার মা বসিয়া
পাকুয়ান বানায় বসিয়া,
এই না পাকুয়ান যাইবে
নবীন দোলার দেশেরে।'

নকশি কাঁথা:

ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য লোক শিল্পের উদ্ভাবন হয়েছে। প্রয়োজনের বস্তু তৈরি করতে গিয়ে তা সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। এতে মনের রং ও হৃদয়ের স্পর্শ লেগেছে। লোক শিল্পের একদিকে অতীতের স্মৃতি মন্থনের, অপরদিকে সমসাময়িক জীবনের প্রয়োজন সাধন। এ দু'দিকের সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে ঐতিহ্যবোধ। এর মধ্যে নকশি কাঁথা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

নকশি কাঁথা বাংলাদেশে অন্যান্য স্থানের মতো খুলনা জেলায় কাঁথার ব্যবহার শুরু হয়েছে তা জানা খুবই কষ্টকর। তবে কাঁথার ব্যবহার যে অনেক বছর পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাঁথায় নকশার কাজে পল্লী রমনীকুল পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নকশি কাঁথা শুধু লোকমনের কাছেই ঠাঁই পেয়ে থাকেনি, অনেক সময় নকশি কাঁথা বিদেশিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

পুরানো পরিধেয় কাপড়ের বিশেষ মাপের কয়েক ফালি সাজিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। তারপর বিভিন্ন পুরোনো শাড়ির পাড়ের সুতো বা তাঁতীর সুতো চার পাঁচ লরি, এক সাথে পাকিয়ে সেলাই করা হয়। আর কাঁথার জমিনে নকশার কাজে সুচে এক একটি ফোড়ই মূলশক্তি। ছোটরড় ফোড়ের কৌশল বিন্যাসে বিভিন্ন ছবি ও নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই নকশি কাঁথা সূচি কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

খুলনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে নানা ধরনের কাঁথার প্রচলন আছে। আবার নানা রকম আঞ্চলিক নামও পাওয়া যায়। কবি জসীম উদ্দীন একটি প্রবন্ধে সাত রকম কাঁথার কথা বলেছেন। যেমন পান সুপারী রাখার খিচা, তসবি বা জপের মালার থলিয়া, ফকিরের ভিক্ষার ঝুলি, বালিশের বেটন, সারিন্দা, দোতারা রাখার আবরণী ও গায়ে দেওয়ার কাঁথা।

বাংলা একাডেমি লোকশিল্প সংগ্রহে দশ রকম কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নকশি কাঁথা, সুজনী কাথী, লেপ কাঁথা, নকশি আসন, দস্তরখানা, গাটরি, বোচকা বা বুগইল বালিশের ছাপা ও বস্তানী। এর মধ্যে কাঁথা ও সুজনীকে শয্যাবরণী, লেপ কাঁথাকে গাত্রাবরণী, খোলকে বালিশের আবরণী বলা হয়ে থাকে। আর জায়নামাজ নামাজের জন্য, আসন পূজার জন্য, দস্তরখান খাওয়ার জন্য, বুগইল পান সুপারি রাখার জন্য, গাটটি ও বস্তানী বই ও তৈজসপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদিও আকৃতি ও প্রকৃতিতে একটির সংগে অপরটির মিল নেই। তবুও এগুলো সবই নকশি কাঁথার অন্তর্ভুক্ত।

কাঁথা সুজানি, আসন, গাটরী ইত্যাদি আকারে বড় করে তৈরি করা হয়। লেপ কাঁথা বেশ পুরু ও লম্বা করে তৈরি করা হয়ে থাকে। জায়নামাজ প্রস্থে ছোট হলেও দৈর্ঘ্যে লম্বা। দস্তরখান লম্বা করে তৈরি করা হয়। কাঁথার পরিমাপের কোন নির্দিষ্টতা নেই। এ ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম মানা হয় না।

নকশি কাঁথার মধ্যে সাধারণত নকশা হিসেবে দেখা যায়, মাছ, পাতা, ধানের ছড়া, সূর্য, চাঁদ, তারা, ঘোড়া, হাতি, দেব-দেবীর ছবি, পদ্মফুল, বিভিন্ন ধরনের ফুল, রাজা, প্রজা, রথ, লতা, পাখি, কুলা, পাকা, কাঁকই, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি।

গ্রামের রমনীদের শিক্ষা-দীক্ষা তেমন নেই। নকশী কাঁথা সেলাই করার শিল্প বোধটুকু তারা শিখেছেন পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে। কাঁথার নকশা তোলার মাধ্যমে তাদের অভিরুচির আনন্দ ও অভিলাষ ফুটিয়ে তোলে। এর পেছনে পেশাগত বহিঃপ্রকাশ নেই। আছে শুধু সুন্দরের কাছে ও প্রেম বৃত্তির কাছে আত্মনিবেদন করা। অনেক সময় লাগে একখানা নকশি কাঁথা তৈরি করতে। তাহলেও অনেক নকশী কাঁথা শিল্পের দিক থেকে সার্থক হয়ে ওঠে।

নকশি পুতুল:

নকশি পুতুল তৈরির প্রচলন বৃহত্তর খুলনা জেলায় অনেক প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীনকালের পোড়া মাটির তৈরি অনেক নকশি পুতুলও পাওয়া গেছে। হাতে তৈরি মাটির নকশী পুতুলে নানা বস্তুর প্রতিকৃতির নিদর্শন থাকে। এতে রঙ থাকে। এতে আবার অনেক সময় লিপিচিত্রও তুলে ধরা হয়। একজন লোকবিজ্ঞানী বলেছেনে, এখানে পুতুলটা মূখ্য, পুতুল চিহ্নিত করা গৌণ ব্যাপার। কোনো কোনো পুতুল ও খেলনার গঠন প্রকৃতি এমন বিমূর্ত হয় যে, উদ্দিষ্ট বস্তুর চিহ্নিত না করলে তার আসল রূপ ধরা পড়ে না।

গোলাকার করে মাটির পুতুলের মাথা তৈরি করা হয়। কান, চোখ, চুল, মুখ, কপালের ঠিক জায়গায় পুতুলের থাকে না। এমনিভাবে কাপড়ের পুতুল বানানো হয়। রঙিন সুতো দিয়ে কাপড়ের বানানো পুতুলকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। তবে সব পুতুলের পা প্রায় একই রকম করা হয়। পুতুলের হাটুর ভাঁজ থাকে না। অনেক সময় পুতুলের পা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুতুলের গায়ে মাটি বা কাপড় দিয়ে নানা অলংকার করে পরানো হয়। খুলনা জেলার পুতুল তৈরির অনেক শিল্পীর বসবাস আজ আছে। খুলনার বিভিন্ন গ্রামের মেলায় নকশী পুতুল খেলনা হিসেবে বিক্রি হয়। এ জেলায় কুমার মাটির পুতুল, সুতার, কাঠের পুতুল ও মালাকার শোলাকার পুতুল তৈরি করে থাকে। আবার খুলনার বিভিন্ন গ্রামে কোন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামের নর-নারীরা মানুষ ও জীব জন্তুকে পুতুল আকারে তৈরি করে থাকে। বর্তমান যুগে নকশী পুতুল শিশুর খেলনা ও গৃহসজ্জার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নকশি শিকা:

নকশি শিকার প্রকৃত রূপকার গ্রামের মেয়েরা। এটি গ্রাম বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামেই নকশি শিকার ব্যবহার আজও বিদ্যমান আছে। খুলনা জেলার মেয়েরা নকশি শিকার কাজে খুবই পারদর্শী। নকশি শিকা তৈরি করতে দু'টি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন হয়। একটি হলো সুতা ও পাট। হাড়ির মধ্যে নানা জিনিস রেখে তা শিকায় তুলে রাখা হয়। লাঠির দু'প্রান্তে শিকা বেঁধে কাঁধে ভার বহার নিয়মও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে একে বাঁক বলে।

পাট বা সুতার গোছায় লরি জড়িয়ে ফাঁস বানানো হয়। লরি জড়ানোর সময় হাতের আঙুলের সাহয্যে প্রয়োজন মতো পাক দেয়া হয়। শিকার নিচে বেড়ি থাকে খুলনা অঞ্চলের কোনো কোনো গ্রামে এ বেড়িকে চাকও বলে থাকে। বেড়ির সাথে ফাঁস লাগিয়ে শিকার মূল দেহ বানানো হয়। উপরের দিকে মেয়েদের চুলের বেনীর ন্যায় করে একটি গিটে বেঁধে দেয়া হয়। পাট বা সুতার সাথে অনেক সময় পুতি, দড়ি, ঝিনুক গেঁথে দেয়া হয়। খুলনা জেলার নানা নামের শিকা পাওয়া যায় যেমন তারাফুল, পুতিফুল, চড়াফুল, টাকাফুল, পদ্মফুল ইত্যাদি।

নকশি পাটি:

খুলনা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে নকশি পাটির প্রচলন রয়েছে। এই নকশি পাটি তৈরি করতে লাগে নল, বেত ও বাঁশ। এ নকশি পাটিতে সাধারণত আঁকা হয় গাছপালা, লতা-পাতা, বাড়িঘর, পালকি, নৌকা, কাকই, হাড়ি পাতিল, হাঁস, কবুতর, পাখি, হাতি, ঘোড়া, হরিণ, নানা রকম ফুল ফল ইত্যাদি। নকশি পাটিতে নকশার কাজে লাল, কালো ও খয়েরী রঙ বেশি ব্যবহার করা হয়।

খুলনা জেলার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নকশি পাটি ব্যবহার হয়ে থাকে। জায়নামাজ, বসা ও শোবার আসন হিসেবে পাটির ব্যবহার রয়েছে এ জেলায়। খুলনা জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে মেয়ে স্বামীর ঘরে যাবার সময় অন্যান্য জিনিস পত্রের সাথে নকশি পাটিও পাঠিয়ে থাকে। নকশি পাটি নিয়ে মেয়েলী গীত আছে। যেমন

'আসুক আসুক বেটির দামান
কিছুর চিন্তা নাইরে।
আমার দরজার বিছায় থুইছি
কামরাঙ্গা পাটিরে।'

বৃহত্তর খুলনা জেলার লোকচিত্রকলার মধ্যে আরো রয়েছে মেঝের আলপনা, দেয়াল চিত্র, কুলা চিত্র, পিড়িরচিত্র, সরাচিত্র, পটচিত্র, দারুচিত্র, মুখোশ চিটত্রি, অংগ চিত্র ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নান্দনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লোকচিত্রকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এগুলোকে অবহেলা করলে লোক সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে না আগামীদিনে। ফলে শিক্ষা প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত কিংবা কোন শিল্প আন্দোলনে অবদান যোগাবার অসাধারণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে। শুধু বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই নয়; সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতে রয়েছে লোকচিত্রকলা। সেখানেও রয়েছে লোক সংস্কৃতির অন্যান্য সমৃদ্ধ ধারা। এগুলো আজ নানাভাবে হারাতে বসেছে। তাই বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির অন্যান্য ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লোক সংস্কৃতি গবেষণায় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে।

বাক্যহীন নিস্তব্ধতা

ফাহমিদা আহমেদ
আইডি নং: ২১৪১২৫১০১৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদ্যগত আনন্দঘন রেশ ধরণীর বুকে থেকে,
তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি।
আকাশের নীলিমায় সমুদ্রজল ছুঁয়ে,
তখনো মনে হয়নি জীবন থমকে যাবে,
চার দেওয়ালের আড়ালে।

সেদিনের হাসি হতে পারত, জীবনের শেষ হাসি।
সেদিনের কথা হতে পারত, জীবনের শেষ কথা।
সেদিনের দেখা হতে পারত, জীবনের শেষ দেখা।
সেদিনের গল্প হতে পারত, জীবনের শেষ গল্প।
সেদিনের কবিতা হতে পারত, জীবনের শেষ কবিতা।
সেদিনের ইচ্ছে হতে পারত, জীবনের শেষ ইচ্ছে।
সেদিনের অপেক্ষা হতে পারত, জীবনের শেষ অপেক্ষা।
কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন !!!!
প্রিয়জন হারানোর ক্ষতের মূলে রয়েছে গভীর,
যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে।

অসাবধান মুহূর্তে মহামারীর কাহিনী শেষ হলে,
বাক্যহীন নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থাকব,
বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে...।

Struggles of Being an Ambivert During Quarantine

Anika Meher Amin
ID: 19251025, Session: 2018-19
Department of Business Administration in Marketing

Many people like to describe themselves as introverts or extroverts. They can easily say what they like to do and what they want in life. But do you ever feel like you're not sure what you want? Sometimes you love socializing and going out, while sometimes you just want to stay home, curl up and hibernate for a few months away from everyone. These are a few familiar feelings that ambiverts often encounter. See, I'm aware I am describing most people these days. Thanks to raising awareness, the popularity of such knowledge and of course, the internet, people have a tendency of finding everything relevant, and thus every trend or meme on social media is suddenly relatable even if normally asked, you can't relate to it at all. Let's focus on the people who are befuddled about who they comply with. They don't know if they want to smile at every passerby or they want to sit in a corner, go about their days, and hiss at anyone trying to get close like an angry cat. Now you're probably thinking that I'm just blabbering on about every other person, that's precisely what I'm doing. Cause most people cannot label themselves that easily. Whether they want to socialize or stay silent and observant is highly based on their moods, psychological factors, their surroundings, and how their days are going by. So obviously, during normal days you couldn't really put a finger on your personality trait.

But then the world got struck by this huge pandemic, you're probably stuck at home for days, only going out for necessities, or may be some of you are a tad bit rebellious than the others. This is the time when you actually get to know the person that you really are and also get a glimpse of how the people you are living with are. Sure, some of you might get a lot of time to reflect on ourselves and have self-actualization moments, but most of us got this chance during the quarantine. If you're stuck at home for months, running out of activities and chores or even just insomnia has given you the scope to think about what you really want, now's the chance to find out to a more certain extent. You'll notice some of your gregarious friends being completely irritable or constantly annoyed about staying home not having people to talk to or you'll see some of them being at pure bliss being able to be by themselves. Then there's you, you want to talk to people but you also like the time to yourself. You like developing your skills and binge-watching TV series but you also get lonely.

Sometimes you'll feel at peace, swaying to your favorite music, all comfy and free within the confinement of the walls. While sometimes, those very walls will seem to form an inferno for you and the slightest bit of sunlight and breeze coming in through the windows will feel alienating and heavenly both at the same time. May be you have loads of family around cheering you up or may be you live with people but they barely manage to communicate with you. It's normal to feel the need to talk to other people, go out, bask in the sun, anything. People ask you how you do it, whether you feel depressed or lonely and you never have a consistent answer to that. Sometimes you'll say that you got used to it, you even prefer it this way and sometimes you'll just cry to get some snacks in the middle of the night or see your friend. You're an ambivert, you have both of those traits, where you like being silent and by yourself but you also want to see your favorite people. Though people may label themselves or others as introverts or extroverts, which are both great personalities, there's a large number of the population who are the middle man. These people are incorporated with both the traits of introverts and extroverts.

I guess what I'm trying to say is, you can't really label your personality, it will always vary based on various situations. As for this quarantine, the voices in your head will get louder, you will feel like you're stuck at purgatory, not quite being punished but also like you're in a state of privation. Nothing monotonous is good but we are still stuck in the middle of the pandemic. And your physical health and survival is not the only concern, your mental health is too. Try taking care of yourself a bit more, make snacks you're craving with whatever ingredients you can get, polish your skills, appreciate the little things, stare at the sky, relish your cup of coffee in peace or sleep all day if that's what makes you happy. Take some time off your screens and think about what you want to do, maybe a bit of an effort here, and there can grant you more happiness and a sense of belonging than anything else will. Pray for everyone or help anyone in need, whatever can contribute to a better world, even something as simple as feeding a stray, that's a huge contribution, trust me. I hope we're still not stuck in pandemic by the time you read this. Regardless of being an introvert, extrovert or ambivert try to find your own peace. Being an ambivert can be challenging at times, but a huge round of applause to you, for still getting through these days. Focusing on your own mental health is the most necessary right now. You're not answerable to anyone if you don't want to communicate with anyone, sit back, and sip your tea. If you want to talk to people, reach out to a few friends, hopefully at least one of them will be free. We are getting through this together and the silver lining is soon to show itself.

হে প্রজন্ম

মোঃ মাহামুদুন নবী রূপক
আইডি নং: ১৮৪২১০৭৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
আইন বিভাগ

হে প্রজন্ম
কোন এক প্রভাতে
উন্মুক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো-
আকাশটা কেমন রক্তিম হয়ে আছে
লাল টকটকে এক রক্তিম সূর্য
ভাবছো এটা শিল্পীর তুলি আঁকা কোন রক্তিম সূর্য
এটা নয় কোন শিল্পীর তুলি আঁকা রক্তিম সূর্য
এটা শহিদদের ভালোবাসা
স্বদেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা
যে ভালোবাসা এনেছে মুক্ত বাংলার মুক্ত আকাশ
যে আকাশে আজ পাখি পতঙ্গরা মুক্তভাবে ডানা মেলে
শিশু কিশোরের রঙ্গিন ঘুড়ি বাধাহীন হাওয়ায় উড়ে চলে
দিকদিগন্তে আজ নেই কোন মানা
শহিদদের স্বদেশ প্রেমের কথা আজ থাকবে না অজানা।

হে প্রজন্ম
কোন এক প্রভাতে
নির্মল হাতে নদীর জল স্পর্শ করে দেখো-
নদীর জলের রঙ কেমন যেন হয়ে আছে
এ জল বিবর্ণ নয় টকটকে লাল হয়ে আছে সব
ভাবছো এটা শিল্পীর তুলির কোন জল রঙ
এটা নয় কোন শিল্পীর তুলির জল রঙ
এখানে এসে মিশেছে মা বোনের অশ্রু ভেজা রক্ত
ত্যাগের মহিমায় স্বদেশভূমি আজ সিক্ত
যে ত্যাগ নদীকে মিলিয়েছে অতল সমুদ্রের পানে
যে সমুদ্র আজ বাধাহীন ঢেউ খেলে চলে
সাহসী নাবিকের জলযান আজ উন্মুক্ত স্রোতে স্রোতে ভাসে
কোথাও ভাসতে আজ নেই কোন মানা।
মা-বোনের ত্যাগের ইতিহাস আজ থাকবে না অজানা।

হে প্রজন্ম
কোন এক প্রভাতে
খালি পায়ে একলা পথে হেঁটে দেখো-
পথের মাটি কেমন শুষ্ক লাল হয়ে আছে
ধূসরে রাঙা মাটি হয়ে আছে রক্তিম পথ
ভাবছো এটা শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা কোন মেঠোপথ
এটা নয় কোন শিল্পীর আঁকা মেঠোপথ
এ পথে হেঁটে শত বোঝা কাঁধে
লাখো লাখো উদ্বাস্তু বৃদ্ধ শিশু ও নরনারী
উলঙ্গ পায়ে রেখে গেছে ক্ষত বিক্ষত পদচিহ্ন
স্বদেশের তরে মায়া ছেড়ে হয়েছিল পরবাসী
সেই উদ্বাস্তুদের দল রেখে গেছে সেই মায়া ভরা পথ
যে পথে আজ হাঁটতে নেই কোন মানা
উদ্বাস্তু শিবিরের দুঃখকথা আজ থাকবে না অজানা।

সালাম সালাম জানাই স্বদেশপ্রেমী সবে
আত্মত্যাগে আর বলিদানে
মুক্ত প্রজন্ম আজ তোমাদেরই তরে
ভুলবে না কভু তোমাদের এই ক্ষণ
যুগ যুগ বাজাবে তোমাদের বিজয়ী সেই বীণ।

Tale of BUP BNCC PLATOON

Md. Fahim Imtiaz
ID: 2022151052, Session: 2019-20
Department of Business Administration in Finance and Banking

Founder Students of BUP BNCC PLATOON

Bangladesh University of Professionals established with a mission to develop the civil and military human capital through advanced education and research to respond to the knowledge -based society of the contemporary world.

They have an enviable success in achieving their goal. Besides providing higher educations to the military sector of Bangladesh, they are also grooming up the best civilian students as human resources to the country.

BUP has total 17 actively running clubs to develop and culture their students in several aspects. In 2015, BUP initially got approval to run a BNCC platoon in their campus to promote leadership, civil-military relationship and to motivate the student to be a good citizen.

In the beginning, this platoon didn't have enough interested students to run its journey. So, the existence of the platoon remained veiled for a while.

When I got myself admitted to BUP in the 2019-20 session, I became so proud and happy to see the facilities and friendly behavior from the campus and the authorities. I met some of my ex-cadet friends from college on campus. We already knew the exciting part and the beneficial part of BNCC. So, my friends wanted to open a platoon in BUP. They started communicating with authorities and then we got to know that we already have the permission to open a Platoon in our campus but it is not functional because of lack of students and platoon Commander. They submitted an application

to the registrar office to help them start the platoon in our campus. But that application got postponed due to the Corona pandemic situation.

After completing our First semester via online, some of my friends were willing to apply for BMA. They were thinking if they could start the platoon then they could apply via BNCC. As I already know about their previous attempt so I decided to help them open the platoon. I took lead to collect the names of interested students from all the departments of our batch 2020. After collecting adequate names; me, Barsha and Moumeta submitted another application on behalf of the interested students for reopening the platoon by assigning platoon Commander.

The registrar office helped us in every possible way and we got our first platoon Commander Mohammed Moin Uddin Reza in November, 2020. As soon as we got him as a platoon commander, we started to take preparation to register our self as cadets and to start BUP BNCC PLATOON.

Cadets of BUP BNCC PLATOON

We successfully completed our registration of the first batch with the help of registrar office and our PUO Moin sir on 21st December,2020. Battalion Adjutant of 1 BNCC Battalion, Major Abdus Samad himself were present and led the whole selection procedure. The pioneer batch got 34 registered cadets in the platoon. From 22 August,2021, Assistant Professor Abul Kalam Azad, Dept of Sociology is the Platoon Commander of this platoon.

Within a short period of time, cadets from BUP BNCC PLATOON took active participation in several activities and achieved tremendous success and appreciation. Some of the highlighted achievements and participation of our Cadets are:

1. Cadet Mahdiun Tahmid (Finance and Banking) got Green Card for 85 BMA Long Course [January,2021]

2. Cadet Lance Corporal Mst Moumeta Khanam (Development Studies) participated as an anchor in the Special Campaign organized by BNCC marking the Birth Centenary of the father of the nation.

Cadet Corporal Md Fahim Imtiaz (Finance and Banking), Cadet Shanto Ali (Law) and Cadet Sakib Hasan Rosdy (MCJ) also participated there in a mime act. [January,2021]

3. Cadet Corporal Md Fahim Imtiaz (Finance and Banking) and Cadet Corporal Sunzana Salim Borsha (Public Administration) took part in a cultural segment as presenter together on the occasion of birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Cadet Yusuf Al Nafi (Finance and Banking) and Cadet Rumon Ahmed (Law) also took part in a drama on the same event. Secretary of Secondary and Higher Secondary Division of People's Republic of Bangladesh was present as the chief guest. [March,2021]

4. Cadet Rumon Ahmed (Law) became 1st Runner up in a Quiz competition on the Biography of Bangabandhu arranged by Quizzers Society of BUP. [March,2021]

5. Cadet Corporal Sunzana Salim Borsha (Public Administration) and Cadet Sakib Hasan Rosdy (MCJ) successfully attended a training session arranged by the Department of Disaster Management, Ministry of Disaster Management and Relief. [June,2021]

6. Cadet Corporal Md. Fahim Imtiaz (Finance and Banking) was ranked 1st in the Bengali set speech competition on Bangabandhu's biography.

Cadet Corporal Sanzana Salim Borsha (Public Administration) was ranked 3rd in the set speech competition on Bangamata's life. Both the competition was arranged by Ramna Regiment, BNCC. [August,2021]

Bangladesh National Cadets Corps provides several incentives for the students who are registered as cadets. A student can develop leadership, comradeship, discipline, confidence and good human qualities through an organized training process including limited military training and other trainings for a three years duration. Also, students who applies for armed forces for commission through BNCC, can go to ISSB directly without preliminary written exam.

Cadets of BUP BNCC PLATOON

BNCC cadets can visit India, Sri Lanka, Maldives, Nepal and Singapore as a part of Youth Exchange Program organized by the Government. I got the opportunity to visit Singapore in my college life's cadetship. Beside this, cadets also get opportunities to visit inside our country as part of study tours.

There is a scope for cadets to add additional points/numbers in CGPA by taking Military Science as fourth subject. Though this depends on the decision of the institution. If an institution allows it for their students, it motivates the cadets to learn more and serve more.

BUP BNCC PLATOON just started their journey. We got so many talented and bright students as cadets. I am very hopeful that all of my comrades will shine in life using the experience they'll get from here. I am also confident that this platoon will achieve more and more in future and will highlight the name of BUP as the best institution. Best of luck to BUP BNCC PLATOON!

অনিঃশেষ

মাজহারুল ইসলাম তুহিন
সিস্টেম অ্যানালিস্ট
আইসিটি সেন্টার

শিখেছি অনেক কিছুই,
শুধু মরতে শিখিনি।
এতে শিখার কিছু নেই।
সেই এক অনন্ত যাত্রা।
সে যাত্রায়, কোন বিরতি নেই,
পথে পথে কোন হাঁক ডাক নেই,
কোলাহল নেই।
নেই কোন সহযাত্রী।
একা, শুধুই একা।

একদিন কি হলো জানো?
ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হলো আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না।
সারা পৃথিবী যেন পাহাড়ের বোঝা নিয়ে বুকের মাঝে চেপে বসেছে।
দম বন্ধ হয়ে গেছে,
ছটফট করছি,
বার বার পরিচিত সবার মুখগুলো মনে পড়ছিল।
কি অদ্ভুত!
ভেবেছিলাম হয়তো আর দেখা হবে না।
কিন্তু না আমি তো মরতে শিখিনি।
আমি অনন্ত,
আমি অবিনশ্বর।
আমি যুগান্তকারী।
আমি অমর,
আমি মরতে শিখিনি।
শিখেছি অনেক কিছুই!

Agony!

Md. Arif Hossain
ID: 18161019, Session -2017-18
Department of Public Administration

Queer!
We should have been so near,
Yet, far away;
I have to walk alone—
Rest of the way.

I do not know,
If my words pleases or not;
Yet for me—
They mean more than a lot.

She whispers,
Still loud for me;
I know her heart,
Where it might be.

Doors of your heart are still open,
For me to enter is— totally forbidden;
I must not love therefore,
What I am to then?

What a disguise you had,
Just remain unrevealed;
What a smile you had,
That concealed everything.

It's time to go,
And breathe with the air;
Its wetness causes nothing.
But my worthless tears!

কান নিয়েছে চিলে

শাশীশ শামী কামাল
সহকারী অধ্যাপক
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

[জাতীয় গ্রিডে সমস্যার কারণে ২০১৪ সালের নভেম্বর ১ থেকে নভেম্বর ২ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে এত দীর্ঘ বিদ্যুৎ বিপর্যয় এর আগে হয়নি। এই লেখাটি আমার সেই সময়ের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবে এই অভিজ্ঞতা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।]

কবি শামসুর রহমান 'পণ্ডশ্রম' কবিতাটি আমরা সবাই পড়েছি। কবিতার মূল কাহিনী অনেকটা এরকম- একটি চিল তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আকাশে উড়ে যাচ্ছে। মাটিতে এক লোক তার পাশেরজনকে বলে উঠল- হায় হায় চিল তো দেখি আপনার কান নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই কথা শুনে সেই লোক তার কান ফেরত পাওয়ার আশায় চিলের বিরুদ্ধে নানা মিটিং ও পরিকল্পনা শুরু করল। পরবর্তীতে দেখা গেল যে কান তার কানের জায়গাতেই আছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক গুজব রটিয়ে দেয় এবং অন্যরাও সেই উড়ো কথার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে হইচই শুরু করে দেয়। এই কবিতা পড়ার পর বরাবরই আমার মনে হতো যে একজন মানুষের মাথায় এমন শয়তানি বুদ্ধি কিভাবে আসে? সামান্য একটি চিল পাখি। সেই চিল পাখি আবার এত কিছু থাকতে কান নিতে যাবে কেন? আর শত শত লোকই বা চিলের মিটিং মিছিল করবে কেন? এরকম কি শুধু বাঙ্গালিদের মধ্যেই হয় নাকি অন্যান্য জাতির মধ্যেও হয়ে থাকে?

তবে গতকালের (২০১৪ সালের নভেম্বর ১) ব্ল্যাকআউটের পর কবিতাটির প্রতি আমার ভক্তি কয়েকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুপুরে বাসায় ফিরে দেখি আমাদের প্রতিবেশী আঙ্কেল ৪০ লিটার পানি, ২০ কেজি চাল ও ৭ কেজি ডাল বাসায় মজুদ করেছেন। আবার ট্যাংক থেকে পানি সেচন করে বালতির পর বালতি ভরাচ্ছেন। পানি সেচ করছেন খুবই আগ্রাসী ভঙ্গিতে। একাই সব নিব, তোরা আমার সাথে পারবি না- এই ধরনের ভঙ্গিমা। তার পানি নেওয়ার ভঙ্গিমা ও দরদর করে ঘামতে থাকা দেখে আশেপাশের মহিলারা অনেক ভয় পাচ্ছে। আমাকে দেখে আঙ্কেল সতর্ক করলেন যে দেশে এক প্রকারের যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। বাঁচতে হলে বুদ্ধি খাটাতে হবে। আমি ঘটনাটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বললে তিনি বলেন যে এত কথা না বলে বিপদের সময় টিকে থাকার জন্য কিছু রসদ সংগ্রহ করতে। আমি তাই করলাম। দোকান থেকে শিক-কাবাব, নানরুটি আর ২ লিটার কোক নিয়ে বাসায় রেখে দিলাম।

বিকালের দিকে কিছুক্ষণ বাসার ভেতর পায়চারি করার পর পরিস্থিতি ভালোমতো বুঝতে আবার বাসার বাইরে বের হলাম। আমাদের বাসার সামনে রয়েছে একটা গলি। দেখলাম সেই গলিতে পিচ্চি-পাচ্চারা খেলছে এবং তাদের শ্রদ্ধেয় মা, খালা, নানী ও অন্যান্য মহিলারা একত্রে গল্প করছেন। আরও নেমে এসেছে আশে-পাশের বাসার যুবতী মেয়েরা। বিকালের পড়ন্ত রোদের মাঝে মেয়েদের কলকাকলি। এদেরকে থার্টি-ফার্স্ট নাইট ছাড়া দেখা যায় না। থার্টি-ফার্স্ট নাইটে তারা বাসার ছাদের মধ্যে একটু খিচুড়ি খায় ও গল্প করে। তারপর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়- ঐধফ ধ ৎবধষষু রিষফ ঢ়ৎথুধঃ ৎড়ড়ভঃড়ঢ়, এই ব্ল্যাকআউটের অজুহাতে তারা যে ফেসবুক বাদ দিয়ে গলিতে গল্প করতে বের হয়েছে সেটা দেখে ভালো লাগলো। তবে এত ভালো লাগার সময় আমার নেই। দেশে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি।

আমি হেঁটে হেঁটে গলির বাইরে গেলাম। বাইরে একটা রমরমা পরিবেশ। খুব ভালো লাগল আমার। এলাকার নাপিত, কসাই, মুরগি বিক্রেতা সবাই এক পরিচিত খুচরা দোকানদারের দোকানে বৈঠক করছেন। শুধুমাত্র দোকানদার সাহেবই ব্যস্ত, বাকিরা সবাই বেকার। উনাদের সবার সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক। ভালো ছাত্র এবং ভালো চরিত্রের ছেলে হিসাবে আমাকে চিনে সবাই। ভালো চরিত্র ভাবে কারণ আমাকে দেখে তারা ধারণা করে নিয়েছে আমি হাবাগোবা এবং আমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই। সত্যিই তাই। আমি অনেক ভালো। কোন মেয়ে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করছে আর কোন মেয়ে ফেসবুকে কি স্ট্যাটাস দিচ্ছে এসব হাবিজাবি নিয়ে কখনোই আমি ভাবি না। দোকানে আসা সবার সাথে খাতির থাকায় তারা বিভিন্ন সময় আমাকে বিভিন্ন গোপন ইনফরমেশন দিয়ে থাকেন। আজকে জানালেন যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে বাঙালি হত্যার পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে ভারত মাতা। ইহুদি ইসরাইল ও আমেরিকারও একটু একটু যোগসাজশ থাকতে পারে, যেহেতু ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলার প্রতিবাদ করেছিল বাংলাদেশ। দোকানদার সাহেব আমার কানের কাছে এসে মৃত্যুর পূর্বে সান্ত্বনা দেয়ার মত করে বললেন- "তুমি বাবা চুপিচুপি তিনটা মোমবাতি নিয়ে যাও। সবাইকে দিচ্ছি না"। দোকানে সবার মাঝে এক চাপা উত্তেজনার অনুভূতি। দেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গেলাম আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। দেখলাম যে প্রেমিক-প্রেমিকারা ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হয়েছে। আমি আমার বন্ধুদের সাথেই ক্যাম্পাসে হাঁটতে থাকলাম। চারপাশের পরিবেশ দেখে আমার বন্ধুদের মন খারাপ হয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ার এর ছেলেরা আবার এর মধ্যে মিছিল শুরু করেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে অসাম্যের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী স্লোগান দিচ্ছে- "কেউ পাবে, কেউ পাবেনা- তা হবে না, তা হবে না"। আমার বন্ধুরা কিছুক্ষণ মিছিলরত ছেলেগুলোকে গালিগালাজ করল, কাজ নাই তাদের, সারাক্ষণ ফাজলামি। তারপর আবার প্রেমিক-প্রেমিকাদের নিয়েও কিছুক্ষণ টিটকারি করল। বন্ধুরা আসলে কাকে সমর্থন করছে আর কার বিরোধিতা করছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিজের আপন কেউ না থাকায় সবাই যেনো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। একটু পর কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে যে যার মত মন খারাপ করে বাসায় চলে গেলাম।

রাত ১২ টায় আমি বাসায় ফিরলাম। মা বলল অনেকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে আগামী সাত দিন কারেন্ট আসবে না। ব্যাপারটি আমার কাছে খুব ভয়ানক মনে হলো। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। ঘুমাতে যাবো এমন সময় রাত ১২.৩০ এর দিকেই কারেন্ট চলে আসল। চারিদিকে খুশিতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল। পিচ্চি তো পিচ্চি, বড়রাও চিৎকার দিল। মেয়েগুলা তো এত জোরে চিৎকার দিল যে আমি ভাবলাম কি না কি বিপদে পড়েছে। বদের দল! বিশেষ করে একটা মেয়ে খুবই অহংকারি। যেদিন সত্যিই বিপদে পড়ে চিৎকার দিবে আমি বাঁচাতে যাবো না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

চিল পাখি শরীরের এত অঙ্গ প্রতঙ্গ থাকতে কেন কান নিয়ে উড়াল দেয়, সেটার একটা উত্তর পেলাম। কান আমরা নিজ চোখে দেখতে পারি না। যেই জিনিস সরাসরি আমরা দেখি না, তা আমরা নিজের মত করে বানিয়ে নেই। বাস্তবকে গড়ে তুলি কল্পনা দিয়ে। সেই কল্পনায় আমাদের মনের গভীর চাহিদাগুলোই প্রকাশিত হয়। এই কথা আমাদের এলাকার দোকানদার, নাপিত, কসাই থেকে শুরু করে বড় বড় পন্ডিত- সবার জন্যই সমানভাবে সত্য। দেখতে পাওয়া, না পাওয়ার ছায়াখেলার মধ্যেই চিল নিয়ে যায় আমাদের কান। আমরাও ছুটে চলি তার পিছে। একবার ভাবলাম পাশের বাসার আঙ্কেলকে যেয়ে বলি যে যুদ্ধ তো হলো না, এত পানি, চাল ডাল দিয়ে কি করবেন? যুদ্ধ যে হয়নি সেই খুশিতে এগুলো সব গরীব মানুষদের দান করে দেন। কিন্তু দেশের এনার্জি ফিরে এলেও আমার আর এনার্জি ছিল না। কিছুদিন ধরেই আমার জ্বর। তাই শীত শীত লাগছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

Hope

Sumaiya Tarannum Sujana
ID: 18221080, Session: 2017-18
Department of Business Administration in Finance & Banking

Staring at the moon,
Thousand thoughts peeped.
Staring at the moon,
Thousand hopes blinked.
When again will they hear
Whispers of the wind?
When again will they see clear
Skies of the spring?
When will they get drenched again
In the first monsoon rain?
When will they get adored again
On the shores by the waves?

Hope in their eyes,
Hope in their minds,
Hope in the winds around;
Again they will fly free
Breaking all the bounds!

সুখের সন্ধানে...

ফাতেমা তুজ জোহরা
সহকারী পরিচালক
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং বিভাগ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের বাস, কত বিচিত্র তাদের চিন্তাধারা। বিচিত্র সবার চাওয়া পাওয়া, এই এক মানবজাতির মধ্যেই আছে কত শত ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, মতবাদ, রাজনৈতিক আদর্শ। বৈচিত্র্যময় তাদের জীবনধারণ, তার চেয়ে বৈচিত্র্যময় তাদের মনোজগৎ। এই অবারিত বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য। তা হলো একটি ছোট্ট মনোবাসনা, যার নাম সুখ। বিত্তশালী বা বিত্তহীন, আস্তিক বা নাস্তিক, সভ্য বা অসভ্য, সৎ বা অসৎ, আর্য বা অনার্য যেই হোক না কেন, যেই না আপনার পরিচয় মানব সন্তান তার মানে আপনি সুখ কামনা করতে বাধ্য। মানব সন্তানের সকল কর্মই হয় সুখ লাভের জন্য না হয় দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। একটিবার নিজে নিজে ভেবে দেখুন তো এমন কোনো কাজ আছে কি না যা আপনি স্বেচ্ছায় করেন কিন্তু সুখ পান না। ছাত্ররা বলবে "কই পড়াশোনা তো স্বেচ্ছায় করি আনন্দ বা সুখ কোনটাই তো পাই না ", কর্মজীবিরা বলবেন, "কই আমার কাজ তো আমার কাছে যন্ত্রণা মনে হয়"। যদি পড়াশোনা বা নিজের কর্মজীবনের কাজটি করে সুখ না পান তাহলে নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন "কাজটি কি আমি নিজের ইচ্ছায় করছি নাকি বাধ্য হয়ে করছি?"। বাধ্য হয়ে করলে সুখ পাবেন না এটাই তো স্বাভাবিক, তবে বাধ্য হয়ে করা কাজটার উদ্দেশ্য থাকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। এখন মিলিয়ে দেখুন আপনার জীবনের কাজগুলো হয়তো সুখের জন্য করছেন অথবা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ বা দুঃখ কমানোর জন্য করছেন । মানব জীবনের অদ্ভুত এক বৈপরীত্য হচ্ছে মানুষকে কষ্ট করতে হয় সুখী হওয়ার জন্য।

এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সব মানুষের চাওয়া বা বাসনার একমাত্র গন্তব্য যদি সুখ হয় তাহলে পৃথিবীতে এত অসুখী মানুষ কেন? এর উত্তর আপনি ঢাকা শহরের রাস্তায় যেকোনো যানবাহনে চলাচল করার সময় পাওয়ার কথা। একমুখী রাস্তায় (one-way road) নিশ্চয়ই জ্যাম লাগতে দেখেছেন। সব গাড়ির গন্তব্য একই দিকে, বিপরীত দিক থেকে কোনো গাড়ি আসছে না, তারপরও কেন এই রাস্তায় সবগাড়িগুলো আটকে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা? কারণ সবাই গন্তব্যে পৌছাতে চায় তার নিজের ইচ্ছা মতো, নিজের সুবিধা মতো। বাকিদেরও যে ইচ্ছা বা সুবিধা-অসুবিধা আছে তা আমরা তখন ভুলে যাই। আমি যদি আরেকজনের সুবিধা - অসুবিধা চিন্তা না করি তাহলে অন্য ব্যক্তিও নিশ্চয়ই আমারটা নিয়ে ভাববে না। যার ফলাফল এই ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় আটকে থাকা। সুখের রাস্তাটিও এমন। সবাই যদি নিজের মত করে সুখী হতে চায় অন্যের কথা না ভেবে তখন সুখের রাস্তাটা একমুখী হওয়ার পরও প্রচন্ড প্রতিযোগিতার হয়ে যায়। অথচ একমুখী রাস্তাটা হওয়ার কথা ছিল সহযোগিতার।

জীবনটা কি সুখের প্রতিযোগিতা বানাবেন নাকি সুখের সহযোগিতা বানাবেন এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু ব্যক্তির নিজের হাতে। কিভাবে সুখী হতে চান তার ওপর নির্ভর করবে জীবনের গতিপথ। সুখ মানুষ দুই ভাবে পেতে পারেঃ এক) বস্তুগত বিষয়ের মাধ্যমে, দুই) ভাবগত বা আদর্শগতভাবে। ধন-সম্পদ, বিত্ত বৈভব এই সব বস্তুগত জিনিস মানুষকে সুখ দেয়, এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে এই সুখ লাভের পথটা প্রতিযোগিতার । আর জ্ঞান চর্চা, ধর্ম চর্চা, পরোপকার, সুকুমারবৃত্তি চর্চা ইত্যাদি হচ্ছে ভাবগত বা আদর্শগত সুখ। এগুলো লাভের পথে প্রথমটার মতো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেতে হয় না। মানব জীবন তো দেহ সত্তা এবং আত্মসত্তার সমন্বয়ে গঠিত।

আমরা যদি একটি সত্তাকে গুরুত্ব দেই আরেকটিকে অবহেলিত রেখে তাহলে আমাদের জীবন পূর্ণতা পায় না। দেহের খোরাক যদি হয় বস্তুগত সুখ তাহলে আত্মার খোরাক হচ্ছে আদর্শগত সুখ। আমরা হয়তো প্রথমটার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ তার অসুস্থতা আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আত্মার ও যে অসুখ হয় তা আমরা ভুলে থাকি। দৈহিক রোগের রোগীদের থাকার জায়গাটার নাম যদি হয়ে থাকে হাসপাতাল তাহলে আত্মিক রোগের রোগীদের শুমারি করলে হয়তো আমাদের সমাজের প্রতিটি বাড়িই "হাসপাতাল" তকমা পেয়ে যেত। তাই আমাদের উচিত বস্তুগত সুখের চেয়ে আদর্শগত সুখটি বেশি করে চাওয়া। যাতে আমাদের সুখের রাস্তাটি একমুখী এবং সহযোগিতার হয় তা যেন কখনো প্রতিযোগিতার না হয়ে ওঠে।

এ যুগে মানুষ সুখ কোথায় খোঁজে? সুখ খুজতে গিয়ে অসুখে ভুগছে। রবীন্দ্র কিংবা নজরুল নয়, সকলেই আমি আমিই হতে চায়। এর মাঝেই সুখের সন্ধান করে। লোকে পাগল বলবে, বলুক না। তাতে কী! পাগলের সুখ তো মনে মনে। একবার ভাবুন, আপনি অনেক বড় অফিসার, জীবনে অনেক বড় কিছু হয়ে গেলেন, গাড়ি-বাড়ি সব কিছুই দামি আপনার। দুর্ভাগ্য আপনি সময়ের জন্য প্রকৃতির আলো-বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারছেন না। এতটাই ব্যস্ত যে, আপনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, সেটাই ভুলে যান মাঝে মাঝে। সুখ খুজে পাওয়া যায় একজন দিনমজুরের মাঝে। সারাদিনের তীব্র খাটুনির পর রাতে নুন-ভাত খেয়ে শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন সে। জীবনের প্রকৃত সুখ তো তার কাছে। গাড়ি-বাড়ি দামি না হলেও মিষ্টি ঘুম ধরা দিচ্ছে তার কাছে পাড়া-প্রতিবেশীর খবরও নিতে পারছে। প্রকৃত সুখ তো তার কাছেই ধরা দিচ্ছে। সুখ খুজতে অনেকেই বিলেতে পাড়ি জমান। সেখানে গেলে নাকি সুখ পাওয়া যায়। মস্ত মস্ত দালানের ভিড়ে সত্যিই কি সুখের সন্ধান মেলে? তবে এ ভালো থাকার মানুষগুলো দিন দিনই যান্ত্রিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। শহরের টানে,জীবিকার সন্ধানে ছুটে যায় ইট পাথরের শহরে। সেখানে সুখের সন্ধান করতে গিয়ে অসুখের তাড়নায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়।

ভালোবাসার মাঝে যে সুখ লুকিয়ে আছে, তাও স্বার্থপরতার কাছে মাঝে মাঝে হার মেনে যায়। কখনো সংসারে অভাব, কখনো বা চাহিদা মেটানোর তাগিদ। সব মিলিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা এক জীবন। যে জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ঘানি বেশি টানতে হয়। অতঃপর যখন সুখ এসে ধরা দেয়, ঠিক তখন নতুন কোনো অসুখে সেই সুখটাও বিনষ্ট হয়ে যায়। তবুও আমরা সুখের জন্য দুঃখের বীণায় সুর তুলছি অবিরত।

স্বাধীনতা

বনি আমিন
আইডি নং: ২১১২২৯১০০৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

একটা কবিতা লেখা দরকার
নাম রাখবো বাংলাদেশ,
কিন্তু আসছে না মনে কিছুই
আসবে না জানি!
যতদিন না স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারবো
আসবে না কোন ছন্দ
যতদিন না রক্তে ধারণ করবো স্বাধীনতা
এই স্বাধীনতা অর্থহীন,
স্বাধীনতা শুধু কবিতায় নয়
আঁকতে হবে মর্মে!
যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যায়নি একাত্তরে
এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে জন্ম-জন্মান্তরে।
এ তো অস্তিত্বের যুদ্ধ
অনেক কষ্টে পাওয়া এ স্বাধীনতা
একে ধরে রাখতে হবে তো!

সোশ্যাল মিডিয়া: যেসব ব্যাপার না জানলেই নয়!

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
আইডি নং: ১৯৪৩১০২০, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আদিমকাল থেকেই মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তা নিয়েছে। হাতে লেখা চিঠি, কবুতর কিংবা অন্যান্য প্রাণীর ব্যবহার হয়েছে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু, ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর থেকে এই যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে আমূল পরিবর্তন। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া।

ইন্টারনেটভিত্তিক এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের মানুষ সহজেই একে অপরের সাথে দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগ করতে পারে। মার্শাল ম্যাকলুহানের সেই গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম মতবাদটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়েছে, এরপর সোশ্যাল মিডিয়া আবির্ভাবের পর তা পুরো পৃথিবীজুড়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, লাইকি, টিকটক, ইউটিউব, লিংকডইন, ইমুসহ অন্যান্য মাধ্যমগুলো বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। এসব সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ সহজেই তাদের চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছে, যেখানে দূরবর্তী স্থানও কোনো বাধা হয়ে উঠছে না। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ ও সহজিকরণ হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান।

সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য প্রবাহ ত্বরান্বিত করলেও, অবাধ তথ্য প্রবাহে এর নেতিবাচক প্রভাবও বিদ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘটনার মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার সঠিক তথ্য জানার পূর্বেই সাধারণ জনগণ সেই ভুয়া তথ্যকেই সত্য হিসেবে ধরে নিচ্ছে এবং সে অনুযায়ী তারা মন্তব্য করে বসছে। এরকম বহু ঘটনা পরবর্তীতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্যে এবং প্রতিপক্ষের ব্যাপারে জনগনের মনে নেতিবাচক প্রভাব তৈরির জন্যে এমনটা প্রায়শই করে থাকে। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এমন কর্মকাণ্ডের জন্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে ইতিবাচক মতাদর্শ তৈরিতেও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে।

অনেকেই বলে থাকেন, ফেসবুক গুজব ছড়ানোর একটি বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সত্য ঘটনার চেয়ে গুজব-ই যেন ফেসবুকে দ্রুত ভাইরাল হয়। এসব গুজবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষরা। ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, রামুসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুজব ছড়ানের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়েছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়সের মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে থাকেন। নানান শ্রেণি-পেশার মানুষ ও নানান মতাদর্শের মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের একটি বিরাট অংশের মিডিয়া লিটারেসি থাকে না। ফলে তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় যত্রতত্র বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে থাকে। এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের শিকার হওয়ার একটি বড় অংশ হচ্ছে নারীরা। নারীরা হরহামেশা বিভিন্নভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের

দ্বারা হয়রানির শিকার হয়। এছাড়া ধর্মীয় পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলেও অনেক ব্যবহারকারী ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে বসে।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার একটি বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তরুণদের উপর। ফেসবুক, লাইকি, টিকটক, ইউটিউবের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম আজকাল অনেক সস্তা ও অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে যেখানে শিক্ষণীয় কিছুই থাকছে না। এসব কন্টেন্টগুলো অল্প সময়েই ভাইরাল হয়ে পড়ছে। তরুণরা এসব সস্তা বিনোদন দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। এসব সস্তা কন্টেটের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। এমন কন্টেন্ট বিনোদন হিসেবে গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন রুচিশীল সংস্কৃতি তরুণরা বিমুখ হচ্ছে অপরদিকে শিক্ষণীয় কিছু না থাকার জন্যে তরুণরা সেখান থেকে ভালো কিছু শিখতে পারছে না। এমন কন্টেন্ট দেখার ফলে তরুণদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকশিত না হয়ে বরং বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

বর্তমান কয়েকটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধু সংখ্যা বাড়লেও বাস্তব জীবনে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে, দিন দিন বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে। অপরদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে 'ফেক' বন্ধুর মোহে পড়ে, নিকটাত্মীয় বা খাঁটি বন্ধুদের দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার এমন 'ফেক' বন্ধুর মাধ্যমে অনেকে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীনও হচ্ছে। অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অনিদ্রা দেখা দিয়েছে যেটি তাদের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি মস্তিষ্কেরও ক্ষতিসাধন করছে এবং এটি তাদের সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনায় প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নিমিষেই তাদের প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে কিন্তু এর সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজে কিছু নতুন সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। তবে সঠিক ও পরিমিত ব্যবহারই আমাদের এসব সমস্যা থেকে পরিত্রান দিতে পারে। নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে চললে এবং ইতিবাচক কর্মকাণ্ড নিজে করার পাশাপাশি অন্যকে করতে উৎসাহিত করলেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে উন্নতি সাধন করতে পারবো।

বিজয়ের প্রভাতে

নুরুজ্জামান শিশির
আইডি নং: ২১১২২৯১০০৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

আয় মা তোকে আজ স্বাধীনতা দেখাবো-
স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে তোকে আজ নতুন সূর্যোদয় দেখাবো
ত্রিশ লক্ষ শহীদের হাসিমুখে মৃত্যু জয় দেখাবো
দুই লক্ষ বীরাঙ্গনার নতুন করে বাঁচার সংগ্রাম দেখাবো
দুই কোটি শরণার্থীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দেখাবো
আয় মা তোকে আজ বাংলার স্বাধীনতা দেখাবো।
তোর ছোট্ট একগুচ্ছ ফুল দিয়ে আজ
বিজয় দিবসের প্রভাতে আমরা শপথ নিব
এতো সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতা
আমরা সবাই অক্ষুণ্ন রাখবো।
আয় মা আজ বিজয়ের আলোতে মিশে
তোকে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখাবো।

অর্ধশতকের বাংলাদেশ

এস এম নেয়ামতউল্লাহ
আইডি নং: ২০২২৩৩১০৩৪, শিক্ষাবর্ষ: এমবিএ ২০২০-২১ (রেগুলার)
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, দারিদ্র্য পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন কারণে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে "তলাবিহীন ঝুড়ি" বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ কখনোই বৈদেশিক ঋণ ফেরত দিতে পারবে না, অথচ তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ঋণ পরিশোধে সফল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে অভিভূত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখি সমৃদ্ধ দেশ গড়বার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাস্তবায়নের পথে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের ৫০ বছর পর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ দেশ হিসেবে উত্তোরণ ঘটেছে।

১৯৭১ সালের মাথাপিছু আয় যেখানে ছিল ৩৫০ মার্কিন ডলার, বর্তমানে ২০২১ সালে তা ২২২৭ মার্কিন ডলারে পরিণত হয়েছে। ১৯৭১ সালের অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে ২০২১ সালের বাংলাদেশ এই সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই ৫০ বছরে কর্মসংস্থান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০১০-১৭ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর প্রক্ষেপিত বার্ষিক হার ২.৯% এর বিপরীতে ১.৬% হারে শ্রমসংস্থা বেড়েছে। দেশের সার্বিক শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ৩৬%-এ উঠে এসেছে। ৭০-এর দশকের বেকারত্বের তুলনায় কৃষি ও শিল্পের প্রসারণের কারণে ২০২১-এ বেকারত্বের হার অনেক কমে এসেছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ লক্ষ শ্রমিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে এবং ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান ২০২১ সালে সৃষ্টি হবে। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) অনুযায়ী যেখানে প্রবৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ৪% বর্তমানে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ২০২১ সালে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪%। বাংলাদেশের ১৯৭০ ও ৮০ এর দশকের বিনিয়োগ এর তুলনায় বর্তমান বিনিয়োগ অকল্পনীয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হবে ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা। ১৯৭০ এর দশকে যেখানে সার্বিক বিনিয়োগ এর ৫০% ছিল সরকারি, সে ক্ষেত্রে বর্তমানে সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে ২৫% এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ হয়েছে ৭৫%। বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সালে বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন ছিল ৪৫ কিলোওয়াট যা ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৯০ কিলোওয়াট। কল কারখানার বিস্তৃতি, সেচ সুবিধা প্রসারণের কারণে বাইরের দেশের প্রায় সকল গৃহস্থালি এখন দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ১৯৭০ বা ১৯৮০ দশকে ছিল অকল্পনীয় কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৪০০০ মেগাওয়াট যা ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৭০-৯০ দশকের তুলনায় ২০২০ দশকের সড়ক, রেলপথ, সমুদ্র, নৌ বন্দর ও বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫৫০০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ২৮৭৭ কিলোমিটার রেলপথ, ৩৮০০ কিলোমিটার নৌপথ, ৩ টি সমুদ্রবন্দর, ৩ টি আন্তর্জাতিক ও ৮ টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর বিদ্যমান ও কর্মশীল। ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের অবকাঠামো ভয়াবহ নিম্ন পর্যায়ের ছিলো, সেই তুলনায় দেশ এখন এককভাবে উৎপাদন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের উৎপাদনশীল অবস্থানে এসেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ১৫০০০ কি. মি. সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন, ৩৭৫০০ মি. পুল ও কালভার্ট নির্মাণ ও ৮০০ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সুষম খাদ্য উৎপাদন ১৯৭০-৯০ দশকের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ৫০ বছরের বাংলাদেশকে এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে, বাংলাদেশকে ১৯৭০ - ৯০ দশকের মত খাদ্য ঘাটতির দেশ বলা যায় না। বর্তমান বিশ্বে চাল উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ২য়, আম উৎপাদনে ৭ম এবং আলু উৎপাদনে ৭ম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ শিল্প কারখানায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৭১ সালে সারা দেশে ১২৭৬ টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্তীতে দেশে শিল্পায়নের সারথী হিসেবে তৈরি পোশাক ও ওষুধ শিল্প কাজ করেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক ক্ষেত্রে ৩৪ বিলিয়ন ডলার পরিমান রপ্তানি করেছে যা ৩০ লক্ষাধিক শ্রমিকের লাভজনক কর্মসংস্থান দিয়েছে। দেশে বেড়ে উঠেছে বস্ত্র ও সুতা বুনন, ওষুধ ও কৃষি শিল্প, মৎস্য ও সামুদ্রিক শিল্প, খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারী শিল্প। বর্তমানে জিডিপির ৩৫% শিল্পখাত থেকে উৎসারিত হচ্ছে, দেশ এখন ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রথম চার দশকের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৯৫% এ উঠে এসেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ৫-১২ বয়সের সকল শিশু শিক্ষা পাচ্ছে, সকল বয়স্ক মানুষের ৮০% এখন স্বাক্ষর। দেশে বর্তমানে এখন ১৪৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১১১টি মেডিকেল কলেজ, ৩৫টি ডেন্টাল কলেজ বিদ্যমান। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার হার প্রায় ৭০% এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে জিডিপির ২% শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে প্রযুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ৭০১ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করবে বলে স্থিরকৃত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৭০ দশকের তুলনায় বাংলাদেশ বর্তমানে আলোকিত ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদনযোগ্য ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পর এই ৫০ বছর শেষে বাংলাদেশ আর্থসামাজিকভাবে উন্নত ও দ্রুত অধিকতর উন্নয়নের পথে আত্মবিশ্বাসী অভিযাত্রী। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দেশবাসী কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির জনকের স্বপ্নের বাংলাদেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে গৌরবের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

The Wicked Hand

Nashiba Samarat
ID: 19251077, Session: 2018-19
Department of Business Administration in Marketing

After Rebecca had her first miscarriage, she was diagnosed with high blood pressure and eventually that led her to having a mild stroke. Her spouse, Reehan is a wonderful man but slightly indecisive and her in-laws are not only moderately educated but also a little superstitious. Rebecca continued to take her medications and took good care of herself, but she was frustrated, scared and exhausted. Rebecca's husband, Reehan, was likewise working on himself to cope by becoming a workaholic while she used to paint and cook to busy herself for mental calm.

One-night, Rebecca suddenly noticed her fingers of her left-hand started to flicker automatically and within seconds she involuntarily grabbed her right hand so tightly that she felt someone was controlling her hand. She was in excruciating pain and screamingly crying until her husband hurriedly entered the room and her left hand returned to normal. Rebecca was terrified, the blood clots in her right hand were obvious, and her husband was taken aback. Rebecca was telling her husband about the occurrence, and she stated that she believes an evil spirit has taken possession of her hand. Her husband assumed she was despondent, so she began self-harming.

A week later, Rebecca was painting with her sister in law Rayema, suddenly her left hand involuntarily started to move again and gripped the paint brush hard. She wasn't aware of what her hand was doing until Rayema called her out, and her hand went back to normal within minutes. A few moments later it happened again and because of the excessive pressure the paint brush broke. Rayema was perplexed and asked Rebecca if it had happened before. Rebecca informed her of the occurrence last week and what it felt like. She had the impression as if she possessed a wicked hand. Rayema got scared and immediately informed Reehan and their family. Because the family was superstitious, they asked Reehan take Rebecca to a Tantric to be free of the demonic presence.

The Tantric confirmed about the existence of evil spirit and told Rebecca that the evil spirit may have contributed to her miscarriage and that she should isolate herself from her society because she may cause harm to other people. He also said he'll have to use some of his special powers to expel the demonic presence, thus he'll be needing a huge amount of emuneration. His words somehow made Rebecca feel guilty, as if she hadn't taken sufficient care of herself while being pregnant. As a result, she began to mistrust herself and naively believed the Tantric. Rebecca was

extremely terrified and agreed to do whatever the Tantric asked, but Reehan thought it was ridiculous. He had doubts about the Tantric from the very beginning, but he kept quiet due to Rebecca's obstinacy. Rebecca and Reehan's family members were also on her side, thus under duress, Reehan ended up paying a considerable fee to the Tantric for Rebecca's treatment. The Tantric informed Rebecca that the demon had left her and that she could return to her normal life after the therapy was completed. Rebecca exhaled a sigh of relief and thanked the Tantric with some extra cash, while Reehan remained skeptical.

Rebecca invited everyone to dinner at her house to celebrate her relief. It wasn't easy for Rebecca to deal with one crisis after another; she was anxious, traumatized, and terrified all at once. Because of these continual terrible incidents, Reehan was also exhausted, doubtful, upset, and agitated thus they needed a break from sorrow.

However, while serving dinner, Rebecca's left hand abruptly grabbed her throat and began choking her so hard that she became unconscious. The family members were afraid and began to pray when Reehan called an ambulance. Rebecca was given immediate pain relief at a nearby hospital, after which Reehan transferred her to a well-known hospital. Meanwhile, family members sought advice from a number of Exorcists and Tantrics to learn about possible answers, but Reehan dismissed them all as ludicrous. Doctors at hospitals were initially confused, but after extensive research, they were able to determine the correct diagnosis. Few weeks after the incident, Rebecca was diagnosed with a rare neurological disease called "The Alien Hand Syndrome."

Alien Hand Syndrome (AHS) or some say Dr. Strangelove Syndrome, is a bizarre condition in which a person loses control of their hand and it begins to behave on its own. It refers to one limb's involuntary complicated goal-directed action. After a stroke, trauma, or malignancy, some people experience alien hand syndrome. It's been linked to cancer, neurological illnesses, and brain aneurysms in the past which pretty much goes with Rebecca's condition. Unfortunately, Alien Hand Syndrome has no known cure yet. Scientists are working on remedies to alleviate the symptoms of alien hand syndrome, but no therapies or pharmacologic choices have been developed. But it can be controlled by some medications and constant mental therapies.

Meanwhile, Reehan has filed a lawsuit against the Tantric for deception and financial fraud. Rebecca finally realized it wasn't tied to any demonic presence and began taking the medications prescribed by the doctors properly.

Rebecca's fear is now gone someway, she has become a rational thinker and more creative. Reehan has become more confident than ever yet considerate. Seems like a ray of hope somehow sprinkled upon them to discover themselves and each other again.

Bibliography:

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059570/#:~:text=Alien%20hand%20syndrome%20is%20a,and%20rarely%20stroke%20(1)
- https://www.healthline.com/health/alien-hand-syndrome
- https://www.medlink.com/articles/alien-hand-syndrome

জাপান থেকে শেখা

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ওকিনাওয়া নামক এক দ্বীপে পড়ার জন্য সুযোগ পেলাম। জাপানে প্রায় ছয় বছরের মতো থাকতে হয়েছে। অনেক অনেক ভাল লাগার স্মৃতি, সেই সাথে জাপান থেকে, জাপানিজদের থেকে অনেক কিছু শেখা হয়েছে। এর কিছু অংশ নিয়েই এই লেখা।

দায়িত্ববান এবং কাজে আন্তরিকতা: জাপানিজরা যে কাজ করুক না কেন, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করার চেষ্টা করে। নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করানো জাপানে অপরাধ গণ্য করা হয়। কোনো একদিন ল্যাবের বিদেশি এক ছাত্রী একটা গবেষণার কাজ ল্যাবের এক জাপানিজ ছাত্রকে দিয়ে করাতে চায়, জাপানিজ ছাত্র অবাক হয়ে যায়। পরে আমাদের সুপারভাইজর ঐ বিদেশি ছাত্রীকে বোঝান। কেউ যদি ল্যাব থেকে আগে চলে যান, ক্ষমা চেয়ে নিতেন সবার কাছ থেকে। জাপানিজ ছাত্রছাত্রীদের দেখতাম গবেষণার শেষ কয়েকটা দিন অনেক কাজ করত, এমনকি রাতে বাসায় যেত না, কাজ করতে করতে ল্যাবেই রাত কাটাত। যখন ক্লান্ত হয়ে যেত, ল্যাবেই কোন এক কোনায় বিশ্রাম নিত। আর সময় সম্পর্কে জাপানিজরা খুবই সচেতন। কোন কাজ সঠিক সময়ের ভেতর করা, কোন স্থানে সঠিক সময়ের ভেতর উপস্থিত হওয়া চাই। যদি কোনো কারনে দেরি হত, এর জন্য বারবার ক্ষমা চাওয়াও এখানে রেওয়াজ।

অন্যকে এবং অন্যের কাজকে সম্মান করা: প্রতিদিন সকালে ল্যাবে আসার সময় বিশ্ববিদ্যালয় যিনি ঝাড়ু দেন, তাঁর সাথে দেখা হয়। সবাই, হোক সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, প্রফেসর অথবা ছাত্র, ওনাকে আন্তরিকতার সাথে শুভ সকাল বলছেন, উনিও সাথে সাথে উত্তর দেন। আমাদের প্রতি বছর ল্যাব এবং বিশ্ববিদ্যালয় এর আশপাশ পরিষ্কার করার একটা বিশেষ দিন থাকত। বিশ্ববিদ্যালয় এর আশপাশের যত আগাছা থাকত, অথবা যা অপরিষ্কার এবং ক্ষতিকর ঐদিন টায় প্রফেসর, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তারা মিলে পরিষ্কার করতেন। পরে শুনেছি অন্যের কাজকে সম্মান, এবং কোন কাজকে অসম্মান যেন না করা হয়, এর জন্যই মূলত এমন আয়োজন। ল্যাবের যে কোনো পার্টি শেষে আমরা সবাই মিলে পরিষ্কার করতাম, এটাও অন্যতম দায়িত্ব ছিল। জাপানের প্রায় প্রতিটা টয়লেটেই শিশুদের জন্য, মায়েদের জন্য, বয়স্ক মানুষের জন্য, প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। যেন কেউ সমস্যায় না পড়েন, এবং অক্ষম না ভাবেন।

সততা: জাপানিজরা সৎ। এটা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু জাপান গিয়ে দেখলাম, মানুষ কতখানি সৎ হতে পারে। আমার পাশেই যে ছেলেটা বসত, ও মাঝে মাঝেই মানিব্যাগ টেবিলে রেখেই বাইরে চলে যেত, আমি অবাক হয়ে যেতাম, ভাবতাম আমাকে কতই না বিশ্বাস করে! পরে বুঝলাম, অন্য কেউ যে মানিব্যাগ থেকে কিছু নিবে এটা ওর কাছে অসম্ভব ছিল। এমন এক পরিবেশে সে বড় হয়েছে, যেখানে এমনটা কেউ করে না। জাপানিজরা অথবা অনেকদিন জাপানে যারা থাকেন, তাঁরা বেশিরভাগই বাসার দরজায় তালা মারেন না। আমার এক ভিয়েতনামিজ এবং ফিজির বন্ধু কয়েকবার তাঁদের মানিব্যাগ হারিয়েছেন, প্রতিবার কেউ না কেউ ফেরত দিয়ে গেছেন, অথবা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে রেখে গিয়েছেন, সব কিছু সমেত। কোন একদিন দেখলাম এক ছাত্রের বাইকের উপর কেউ একজন টাকা এবং কিছু জাপানিজে লিখে টেপ দিয়ে আটকে দিয়ে গেছেন। পরে জেনেছি, কারও বাইকের সাথে তাঁর বাইকে ধাক্কা লাগে, এবং বাইকের কিছু ক্ষতি হয়। যিনি লাগিয়েছেন, তিনি ক্ষমা চেয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়ে

গেছেন! আমার সহধর্মিণী কয়েকবার মোবাইল হারিয়েছেন, আবার ফেরতও পেয়েছেন।

স্বাস্থ্য সচেতন: জাপানিজরা স্বাস্থ্য সচেতন। আর এর জন্য প্রতিদিন হাঁটা, দৌড়ানো, সঠিক খাদ্যভাস গড়ে তোলেন। জাপানে শরীরে মেদ থাকাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিভিন্ন প্রোগ্রামের, যেমন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে মানুষ উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। জাপানিজরা সামুদ্রিক খাবার খুব পছন্দ করে। জাপানে কিছু খাবার আছে যা খুবই স্বাস্থ্যকর। নোরি, যা সামুদ্রিক উদ্ভিত থেকে বানান, নাট্টো, মিসো সুপ ইত্যাদি। ওকিনাওয়াতে করল্লা খুবই জনপ্রিয়, বিশেষ করে গ্রীষ্মে করল্লার শরবত খুব জনপ্রিয় ছিল। আমরা মাঝে মাঝেই বলতাম, "আমরা খাই মুখের স্বাদের জন্য, আর জাপানিজদের কাছে মুখের স্বাদের থেকেও সুস্বাস্থ্য ব্যাপারটাই মুখ্য।"

শিশুদের দেশ: জাপানকে বলা হয় শিশুদের জন্য আবাসস্থল। রাস্তায় শিশুরা নির্দ্বিধায় চলা ফেরা করে। জাপানের স্কুল গুলোতেই শিশুদের শেখান হয় একা একা কিভাবে চলতে হবে। আর শেখান হয়, মিথ্যা বলা যাবে না, অন্যের ক্ষতি করা যাবে না, অন্য কোনো প্রাণীকে, তা পতঙ্গই হোক না কেন, অহেতুক আঘাত করা যাবে না। এগুলো শুধু মুখে নয়, হাতে কলমে শেখান হয়। জাপানের রাস্তার সিগন্যালে শিশুদের নাগালের ভেতর রেড সিগন্যাল সুইচ রাখা হয়, টয়লেট, খাবার দোকানগুলোতে গুলোতে থাকে আলাদা ব্যবস্থা।

এমন অনেক অনেক ভাল কিছু শেখার ব্যাপার রয়েছে জাপান থেকে, জাপানিজদের কাছ থেকে যা আমরাও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করতে পারি।

কোয়ারেন্টাইনের খপ্পরে মহামনীষীগণ

ড. মোঃ মোহসীন রেজা
সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান
ইংরেজি বিভাগ

অতিমারি করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় দেড় বছর যাবত আমরা কোয়ারেন্টাইনে আছি। কিন্তু আমাদের আগে বহু মানুষ, এমনকি অগনিত বিশ্ববিখ্যাত মনীষী-মহামনীষীগণকে কোয়ারেন্টাইনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়েছিল। বাদ পড়েননি শেক্সপিয়ার, নিউটন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চসার, মেরি শেলী, সিলভিয়া প্লাথ, জেমস্ জয়েস, ক্যামু, মোপাঁসা, বোদলেয়ার, নিৎসে এবং আরও অনেক মনীষী।

বার্ড অব এ্যাভন (এ্যাভন নদীর বাউল) বা বার্ড অব হ্যাভেন (স্বর্গের পাখী) খ্যাত ইংরেজ দিকপাল কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘতম সময় ধরে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি। শেক্সপিয়ারের জন্মই হয়েছিলো কোয়রেন্টাইন-ঘোরতর প্লেগের মধ্যে। শেক্সপিয়রের জন্ম ১৫৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল। আর ১৫৬৩ সাল থেকে ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত টানা ৩ বছর ইংল্যান্ড জুড়ে চলে প্লেগ এর আক্রমণ। মারা যান ৮০ হাজার মানুষ। মৃত্যুবরণ করেছিলেন শেক্সপিয়রের ৩ বোন জোয়ানা, মার্গারেট ও অ্যানসহ তাঁর এক ভাই ও অগুনতি আত্মীয়স্বজন। তো জন্মলগ্নেই টানা ২ বছর কোয়ারেন্টাইন খাটতে হয় শেক্সপিয়ারকে। এরপর তাঁর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির সময়টাতে প্লেগ তিনবার ভয়াবহ আক্রমন চালায় ইংল্যান্ডেঃ ১৫৯২, ১৬০৪ ও ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শেক্সপিয়র গেলেন কোয়ারাইন্টাইনে। ১৫৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শেক্সপিয়ার প্রকাশ করেন কাব্যগ্রন্থ 'ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডনিস', এবং 'দ্য রেপ অফ লুক্রিস'। দুটো লেখাই কোয়ারাইন্টাইন্ড অবস্থায় লিখেছিলেন তিনি। ১৫৯২ -৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্লেগে লন্ডনে মারা যান ১১ হাজার লোক। এবারও ২ বছর গৃহঅন্তরীণ। এরপর বহু ট্রাজেডি স্রষ্টা শেক্সপিয়ারের নিজের জীবনে ঘনিয়ে আসে ভয়ংকরতম ট্রাজেডি। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগের থাবায় মাত্র ১১ বছর বয়সে মারা যান তাঁর পুত্র হ্যামলেট। পুত্রের নামেই পরে রচনা করেছিলেন বিশ্বখ্যাত ট্রাজেডি হ্যামলেট। সাত বছর পর ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ প্লেগের সময় কোয়ারেন্টাইনে বসেই শেক্সপিয়ার লিখলেন বিখ্যাত ট্রাজেডি ওথেলো (প্রকাশিত ১৬০৪)। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবারও প্লেগের খপ্পরে কোয়ারেন্টাইনে বসেই শেক্সপিয়র রচনা করেন 'চেম্বারলিন'। এছাড়া দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকার মতে শেক্সপিয়র কোয়ারেন্টাইনে 'কিংলিয়র' নাটকটিও লিখেছেন।

আপন চার ভাই-বোন ও পুত্র হ্যামলেট ছাড়াও প্লেগ রোগে মারা যান শেক্সপিয়রের ৩ নাতি শেক্সপিয়ার কুইনি, রিচার্ড কুইনি এবং থমাস কুইনি। মারা যান শেক্সপিয়র পরিবারের ৮ জন সদস্য। শেক্সপিয়ার তাঁর ৫২ বছরের জীবনে, প্রায় ১০ বছরই কাটিয়েছিলেন কোয়ারেন্টাইনে। আমাদের বঙ্গবন্ধুও তাঁর ৫২ বছরের জীবনে, প্রায় সাড়ে ১২ বছরই কাটিয়েছিলেন কারাগারে। শেক্সপিয়ার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্ম। অতএব কোয়ারেন্টাইনে হতাশা নয়। কোয়ারেন্টাইন দিয়েও পাল্টে দেয়া যায় পৃথিবী।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগের আক্রমণে লন্ডন শহরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। ২৩ বছরের টগবগে যুবক আইজ্যাক নিউটন তখন ক্যামব্রীজে পড়ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আদেশে নিউটন চটজলদি পাততাড়ি গুটিয়ে কোয়ারেন্টাইনে চলে গেলেন পরিবারিক খামারবাড়ি লিঙ্কনশায়ারে। বিশাল বাড়িটির জানালার গরাদের ফাঁক গলে সূর্যের

আলো এসে খেলা করে ঘরের মেঝেতে। দীর্ঘ সময় ধরে একদৃষ্টিতে নিউটন তাকিয়ে থাকেন সেই আলোর দিকে। মনে মনে ভাবেন বাঁধা পেলে আলো কি বেঁকে যায়? কিংবা আলোর প্রকৃত রং-টাই বা কী? শুরু হলো আলোক তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা। কোয়ারেন্টাইন্ড অবস্থায় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ ও গতিতত্ত্ব নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। এ নিয়ে মজার গল্পটি আপনারা জানেন। কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলোতে নিউটন বাগানে বসেছিলেন। হঠাৎ একটি আপেল মগডাল থেকে সোজা পড়ল মাটিতে। নিউটন ভাবতে লাগলেন আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন? চাঁদও তো আকাশে ঝুলে আছে। চাঁদ তো মাটিতে আছড়ে পড়েনা। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের চিন্তার ভ্রূণ। নিউটনের চিন্তার গর্ভে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অঙ্কুরোদগম হয়েছিলো কোয়ারেনটাইনে বসেই। অনেকেই এটা গল্প হিসেবে উড়িয়ে দিলেও এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি কয়েক বছর পর নিউটনের লেখা চিঠি থেকে। নিউটন বন্ধুকে লিখেন- "কোয়ারেনটাইনের দিনগুলোতে আমার কাছে অনেক সময় ছিলো। তাই যেসব প্রশ্নের উত্তর তখন পর্যন্তও পাইনি সেগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করি। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে যে চিন্তাভাবনাগুলো মাথায় খেলা করছিলো সেগুলোই পুনরায় কালিয়ে নিচ্ছিলাম"। ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৭- কোয়ারেন্টাইনে নিউটন ছিলেন দীর্ঘ ২২ মাস। বাইশ মাসে নিউটন লিখে ফেললেন দুটি গবেষণাপত্র। মাধ্যাকর্ষণ এর পূর্ণ তত্ত্বটি নিউটন দিয়েছিলেন আরো ২০ বছর পর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও মাস দেড়েকের মতো কাটাতে হয়েছিল হোম কোয়ারেন্টাইনে। তথ্যটি জানা যায় ১৮৭২-৭৩ সালের বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট থেকে। জানা যায়, ১৮৭১ ও ৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেঙ্গু নিয়ে কলকাতায় একটি নোটিশ জারি করা হয়। এর সংক্রমণ সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে, সে সময় কলকাতার অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছিল শহর থেকে কিছু দূরে, গঙ্গাতীরবর্তী বাগানবাড়ীগুলোতে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন-
'একবার কোলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে (পানিহাটিতে) জ্ঞাতিবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমি তাহার মধ্যে ছিলাম।'

ঠাকুর বাড়ির হিসেব খাতার তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটি বেরিয়ে আসে যে, রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ পরিবারের অনেকে ডেঙ্গু থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৭২ সালের ১৪ মে মঙ্গলবার থেকে ৩০ জুন রোববার পর্যন্ত পানিহাটির বাগানবাড়িতে ছিলেন। ডেঙ্গুর প্রকোপ কমলে তাঁরা জোড়াসাঁকোয় ফিরে যান। রবিঠাকুরের লেখার তথ্যমতে, এ সময় তাঁর পরিবারের আরেকটি অংশ গঙ্গাতীরের একটি প্রাচীন পল্লি, যেখানে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি বাগানবাড়ি ছিল, সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির হিসাব খাতার তথ্য অনুযায়ী, ১৮৭২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত পানিহাটির বাগানবাড়িটি ভাড়া করেছিল ঠাকুর পরিবার। পরে ১ জুলাই সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছিল বলেও খাতায় উল্লেখ রয়েছে।

অন্যদিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোয়ারেন্টাইনে বসে যদিও কিছু লেখেননি তবুও কোয়ারেন্টাইনে বেশ নাজেহাল হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সমুদ্রপথে যাচ্ছিলেন মায়ানমার বা বার্মা যখন সমগ্র দক্ষিন এশিয়া জুড়ে চলছিলো প্লেগের তান্ডব। বার্মায় পৌছানোর ঘটনাটা বর্ণনা করতে গিয়ে শরৎবাবু লিখেছেন-"অকস্মাৎ জাহাজের খালাসিরা ডেকের যাত্রীদের শুনিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল-
'রঙ্গম শহর, রঙ্গম শহর, সবাই বিছানাপত্র গুটিয়ে উঠে পড়ো। করনটিনে যেতে হবে, করনটিন না করে কেউ শহরে ঢুকতে পারবে না'।"

জাহাজের খালাসিরা সম্ভবত রেঙ্গুন শহরকে রঙ্গম আর ইংরেজি কোয়ারেন্টাইন শব্দটিকে ভুল উচ্চারণে করনটিন উচ্চারণ করেছিলেন। শরৎবাবু খালাসিদের বললেন-
"আমার করনটিনে থাকার কোনো দরকার নেই। আমি কলকাতায় জাহাজে ওঠার পূর্বেই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। আমার শরীরে প্লেগের জীবাণু নেই।"

জনৈক খালাসি তাকে ধমক দিয়ে বললেন- "একটি কথাও নয়। তাড়াতাড়ি করনটিনে চলে যান। করনটিন না করে কিছুতেই রঙ্গমে ঢুকতে পারবেন না।"

শহর থেকে আট মাইল দূরে কাঁটাবেড়া দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়েঘরের মতো কিছু একটা তৈরি করা হয়েছে। সেটাই কোয়ারেন্টাইন। আর সেখানে দীর্ঘসময় শরৎ বাবুকে কিভাবে নাজেহাল হতে হলো তার বর্ণনাও তিনি নিজেই লিখে গেছেন।

ভয়ংকর ব্লাক ডেথ বা গ্রেট প্লেগ এর সময় ইংরেজী সাহিত্যের প্রথমদিককার লেখক জেওফ্রি চসার তার কোয়ারান্টাইনে অন্তরীণ অবস্থায় লিখেছেন- 'দ্য ক্যান্টারবারি টেলস্'। মেরি শেলী কোয়ারেন্টাইনে থেকে ভয়ানক শ্বাসকষ্ট ও শরীরে কৃত্তিম শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র লাগিয়ে লিখেছিলেন 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন'। সমস্ত দুনিয়া যখন পলিও রোগে আচ্ছন্ন তখন প্রখ্যাত ইংরেজ লেখিকা সিলভিয়া প্লাথ লিখেছিলেন 'দ্য বেল জার'। আয়ারল্যান্ডের রাজধানি ডাবলিনের ৭৫ শতাংশ লোক যখন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত ঠিক সেই সময়টায় ইংরেজি সাহিত্যের অতন্দ্র লেখক জেমস্ জয়েস কোয়ারইন্টাইনে বসে লিখেছিলেন তার বিখ্যাত উপন্যাস 'ইউলিসিস। মোপাঁসা ভয়াবহ যন্ত্রণা নিয়েই লিখতেন কোয়ারেন্টাইনে। একই যন্ত্রনা নিয়েই নাকি লিখেছেন বোদলেয়ার এবং নিৎসে। ফ্রান্সে ভয়াবহ কলেরা চলছে; কোয়ারেন্টাইন আলবেয়ার ক্যামু লিখেছেন তার বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য প্লেগ'।

তাই বলি, এত এত রথী মহরথীরাই যখন এ অনিচ্ছা নির্বাসনে স্যারেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছেন, অতএব, কোয়ারেন্টাইনের প্রতি বিরক্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। বরং অনুরক্ত হলেই লাভ। হাজার হলেও জান নিয়ে যখন যমে-মানুষে রশি টানাটানি, কোয়ারেন্টাইনই হোক এ খেলার মহান আম্পায়ার।

Lost Soul

Priyanka Kundu
Lecturer
Department of Mass Communication and Journalism

During my longing for you
I experienced a change
Becoming 'me'
Dissolving and melting.

Beyond the time and space
An edgy peace
Undying compassion, sentience
Craving for you to come
And grip my defeated bleeding heart.

Love, liberty and ecstasy—
Altogether bring a relaxation
Like a twilight and a sleep
In my awaiting soul.

Your absence made me a nonbeing
Or a more-being
When a mirror reflecting nothing but emptiness.

In my sleeping village
Your arrival resembles a sun
Blinded me with the godly face.
No vindication searched,
Muzzled in serenity
Then it's all about losing
To end with the infinity.

আমার দেখা জানজিবার

মেজর মোঃ এরশাদ মনসুর, ইবি
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (এস্টেট)
চিফ প্লানিং, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

২০১০ সালে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত জানজিবার নামের একটা ছোট্ট দ্বীপে কয়েকদিন জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। তানজানিয়ার অংশ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে এই দ্বীপটি। উগান্ডার এনতেবে থেকে বিমানে চড়ে তানজানিয়ার রাজধানী দারএসসালাম বিমান বন্দরে নেমে সেখান থেকে বিলাসবহুল একটা বোটে চড়ে পৌঁছালাম সেই দ্বীপে। পাসপোর্টে এন্ট্রি করতে হল। যতটুকু মনে পড়ে জানজিবার আনুমানিক ৮০ মাইল পূরণ ৪০ কি.মি. সমান আয়তনের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপ প্রতি বছর অনেক পর্যটক টানে। এই দ্বীপটি নাকি ইউরোপীয় পর্যটকদের খুব পছন্দের। দ্বীপটির রাজধানীর নাম স্টোন সিটি। পাঁচ/ছয়শ বছর আগে এই দ্বীপটি ওমানি সুলতানদের অধীনস্ত ছিল। সেই সময়ে এবং ১৮ শতকে এই জায়গাটি আফ্রিকান ক্রীতদাসদের বাজার হিসাবে খুব জনপ্রিয় ছিল। স্টোন সিটিতে মাটির তলে সেই সময়ে ক্রীতদাসদের বন্দী করে রাখার জন্য তৈরি বিশাল বিশাল গুহা পর্যটকদের জন্য এখনও আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে সরকারীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। গুহার ভিতরে ঢুকে ক্রীতদাসদের বসবাস এর জায়গা দেখে এবং বিক্রির আগে তাদেরকে শক্ত সামর্থ্য হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য অমানবিক ব্যবস্থার বর্ণনা শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে জাল দিয়ে ধরা হতো ক্রীতদাসদের। তারপর অনেকজনকে একসাথে জড়ো করে শত শত মাইল পায়ে হাঁটিয়ে এখানে নিয়ে আসা হতো। তারপর দিনের পর দিন না খাইয়ে এদের গুহায় বন্দী করে রাখা হতো। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে অনেকেই করুনভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। দিনের পর দিন না খেয়ে যারা বেঁচে থাকতো তাদেরকে শক্ত সামর্থ্য হিসাবে গণ্য করে ব্যবসায়িদের কাছে বেশি টাকায় বিক্রি করা হতো। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রেতারা এসে ক্রীতদাসদের এখান থেকে কিনে নিয়ে যেত।

যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত পর্যটক হেনরি মরটন স্টেনলি ১৮৭১ সালে জানজিবার ভ্রমণ করে তৎকালীন ওমানি শাসকের নিকট থেকে অনেক বাণিজ্য সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিলেন। একসময় জানজিবার এর সাথে জার্মানির ভালো বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ১৮৬০ সালের দিকে জানজিবারের একজন বিখ্যাত রাজকন্যা সাইয়েদা সালমা তৎকালীন সময়ে স্টোন সিটিতে ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত জার্মান নাগরিক রুডলফ হেন্রিক রুয়েতের সাথে দীর্ঘদিনের গোপন প্রেমের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে রাতের আঁধারে জানজিবার থেকে পালিয়ে জার্মানি চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বিবাহ পূর্বে ধর্মান্তরিত হয়ে নাম রাখেন এমিলি রুয়েতে। গাইডের নিকট থেকে তাঁদের অমর প্রেম কাহিনী শুনে আমাদের দেশের অনেক প্রেম কাহিনির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এই মহিলার লেখা একটা বই এর নাম, 'ম্যমরায়ার অফ এন এরাবিয়ান প্রিন্সেস ফ্রম জাঞ্জিবার'। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর এই মহিলা অনেক কষ্ট করে দুই সন্তানকে নিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁদের সন্তান পড়ে জার্মান বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

জানজিবার মসল্লা উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত। সেই আমল থেকে এখানে মসল্লা চাষ হয়। এখানকার মসল্লা খুব উন্নত মানের। বেশ কয়েকটা মসল্লা বাগানে গিয়েছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল হরেক রকমের মসল্লা গাছ দেখে।

জানজিবারকে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর উপকূলে ভাগ করা হয়। দক্ষিণে রাজধানী স্টোন সিটি অবস্থিত। বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের জন্য গোটা জানজিবার জুড়ে বিনোদনের হরেক রকমের ব্যবস্থা আছে। উত্তর উপকূল পর্যটকদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। এখানে অনেক আবাসিক হোটেল, উন্নত মানের খাবারের হোটেল, বার, ডিস্কো, খোলা আকাশের নীচে নাচার জায়গা এবং হরেক রকমের উপকূলীয় খেলাধুলা এবং সমুদ্র তলের জগত দেখার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ঐতিহাসিক স্থাপনা সমূহ মূলত স্টোন সিটিতে অবস্থিত। পূর্ব উপকূল গ্রামীণ আবহে গড়ে উঠা একটি পর্যটন স্থান। এই অংশটা শান্তিপ্রিয়, বয়স্ক পর্যটক বা নববিবাহিতরা এসে থাকতে পছন্দ করেন। এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন কটেজ ছোট ছোট খাবারের জায়গা এবং বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

সেই আমলে জানজিবারে ওমানি সুলতান বা তাদের প্রতিনিধিরা খুব আমোদ প্রমোদের জীবন কাটাতেন। কোন কোন সুলতানের শ'য়ের কাছাকাছি উপপত্নি ছিল বলে গাইড এর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। সুলতানদের প্রাসাদ ভ্রমন করে তাদের উন্নতমানের শিল্প এবং অট্টালিকা নির্মাণের নিদর্শনসমূহের সাথে পরিচিত হলাম। এছাড়াও, সেই আমলের পাষাণ হৃদয়ের নামি দামী ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের জীবন কাহিনী শুনে এবং তাদের পুরাতন বাড়িঘর দেখে সেই সময়ে তাদের যাপিত জৌলুশপূর্ণ জীবনযাপন এবং তাদের দ্বারা নিরীহ মানুষের উপর চালানো অত্যাচারের অনেক গল্প জানতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে টিপ্পু টিপু ছিল অন্যতম। টিপ্পু টিপু শুধু বিখ্যাত ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ছিল না, সে হাতির দাঁত এবং মসল্লার ব্যবসাও করত। এই পাষাণ হৃদয়ের ব্যবসায়ী ওমানি সুলতানদের খুব পছন্দের ব্যক্তি ছিল। তার বাড়িটি এখনও সেই আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

জানজিবারে মাঝারি আকারের কিছু বন আছে। এই বনে হরেক রকমের ছোট ছোট প্রাণী বাস করে। তাঁদের মধ্যে হরেক রকমের বানর অন্যতম।
জানজিবার এর মানুষ পর্যটকদের খুব কদর করে। এরা খুব সাধারণ ও নিরীহ প্রকৃতির। আর্থিক দিক দিয়ে এরা খুব একটা সচ্ছল না।

স্বপ্ন

মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর
অতিরিক্ত পরিচালক
পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন বুনি
মোরা হিয়ার মাঝে
স্বপ্নের মাঝেই আছি বেঁচে
সকাল-সন্ধ্যা-সাঁঝে।

বেঁচে থাকার জন্য সবার
স্বপ্ন দেখা চাই,
স্বপ্নহীন জীবন যেন
কয়লা পোড়া ছাই,
কারো স্বপ্ন অনেক বড়, কারো স্বপ্ন ছোট
লক্ষ্যপানে ছুটছি মোরা;
সবাই অবিরত।

শুধু শুধু কেন তোমরা করছ হানাহানি,
কেন তোমরা করছ ক্ষয়
জীবনাত্মার পানি?
আমরা কেবল ছুটতে পারি
আপন লক্ষ্যপানে
লক্ষ্য কি মোর হবে পূরণ
কেইবা বলো জানে?
চেষ্টা তোমার হলে পূরণ-
বিধাতা যদি চান,
লক্ষ্য তোমার দিবে ধরা না হলে অভ্রান।

Innovation in Public Administration: An Important Tool for Simplifying Public Service Delivery in Bangladesh

Helal Uddin
Section Officer
Training Cell

Innovation, in simple words, is the introduction of something new. But in the detailed sense, it refers to the improvement of the existing product or service along with the introduction of newness. It is the process of transforming an idea or invention into product or service that generate different value to the customers. Innovation also refers to the prudent application of information, imagination, and creativity in developing the quality of a product or service. Moreover, innovation is also possible by changing the features and delivery process of the product or service according to the demand from customers. The significance of innovation is increasing day by day to the companies or organizations for making value and strengthening competitiveness in markets. Though the idea of innovation comes from the private sector, now it is a more prevalent and discussed topic in the field of public administration because moving away from the traditional public administration, the world is now shifting towards a people-oriented welfare administration where the needs and demands of the citizens are the main issues.

Innovation in public administration implies changing the service delivery process, developing the existing service, or introducing new services for the greater benefit of the citizen. According to OECD, "public service innovation is the implementation of new or importantly improved operations or products by the public sector organizations". It enables the government to overcome civic challenges in new techniques by enhancing the design and process of public service delivery. Successful implementation of public service innovation creates opportunities for reducing hassle in receiving services and it also improves the effectiveness, efficiency and transparency in the delivery of public services. Strong leadership, meticulous planning, innovation culture in public administration, institutional capacity, skills and the risk-taking tendency of public servants, and efficient stakeholder alignment are very important in the pursuit of public service innovation.

The primary purpose of innovation in public administration is to develop or simplify the public service delivery process considering the needs and demands of the citizens. In order to deliver services to the doorsteps of the people, the existing system of public service delivery provided by various government departments needs to be simplified and expedited. For introducing simple and people-friendly public services, it is necessary to analyze the steps of the existing systems. Through this analysis and discussion with all those involved in the service delivery process, it is possible to identify unnecessary tasks, steps and rules of the process and that can play an effective role in

improving existing systems and standards of service. This is called 'Service process simplification' or SPS. The basic theme of SPS is in-depth analysis of existing service systems to reduce the time, cost and the number of visits (TCV) in receiving services through fundamental and radical changes, and to ensure significant development of service quality and civic satisfaction.

The culture of innovation acts as a catalyst to the process of simplifying public service delivery. In this connection, public administration in Bangladesh started practicing innovation to meet the increasing demand of the citizen in an effective and efficient way. The Government of Bangladesh established the 'Governance Innovation Unit (GIU)' in the Prime Minister's Office in 2012 to encourage innovation practice in administrative activities. The Governance Innovation Unit (GIU), with the motto of "Putting Citizens First", is conducting innovative activities to improve the quality of government services. It is dedicated to serving Bangladesh and its citizens as a 'Think Tank' on good governance and innovation. GIU is working in collaboration with the Ministries of Agriculture, Education, Primary and Mass Education, Health and Family Welfare, Land, Home Affairs, Disaster Management and Relief, and Local Government Division for ensuring good governance and innovation. It helps these ministries to enhance their capacity for innovation, to formulate strategies, and to implement them. At the same time, it encourages the success, transparency and accountability of ministries in providing services and their role in preventing corruption.

Access to Information (a2i) Programme is another pioneer organization which is working to create opportunities for innovation in the administration of Bangladesh. The programme is now redefined as "Aspire to Innovate" and moved under ICT Division from the Prime Minister's office. It provides technical assistance in the implementation, monitoring and evaluation of innovation projects in public administration. Using information technology, the A2I program is working to bring services to the doorsteps of people quickly, transparently, hassle-free, and at a low cost. It is cooperating with the Government of Bangladesh to improve and simplify the process of government service delivery and to introduce citizen-centric innovative culture by making services more inclusive, affordable, reliable and accessible. E-governance, inclusive financial services, inclusive quality education and skills development activities, human resource development and employment generation and innovative culture in government service to solve problems of the citizen are the main areas of activities of the A2I programme. Notable achievements of this programme in simplifying public services are Bangladesh National Web Portal (www.bangladesh.gov.bd), National Help Line (333), Union Digital Center (UDC), Digital Record Room, E-filing system to modernized government offices, e-TIN online tax payment system, using ICT in education, Teachers portal, Multimedia Classroom, Innovation Lab etc.

The main objective of these activities is to provide more quality and satisfactory services to the people and innovation practice acts as an important tool in this service simplification process. Now government offices identify services through their own officers and employees and simplify public services to provide people-friendly and hassle-free services in a creative way through in-depth analysis of existing services. So far 424 service simplification proposals have been made and more than 40 services are being implemented at different levels. The diverse initiatives, undertaken by Access

to Information (a2i) Programme and Governance Innovation Unit (GIU), help in saving time, cost and the number of visits in receiving government services. As a result, people are becoming more interested in receiving those public services.

References

Cabinet Division (2019), "Service Process Simplification (SPS) Manual" Government of the People's Republic of Bangladesh.

Calleja, R. (2015). "Innovation in Government of Public Innovation". Public Governance International (PGI).

Hoque, S.M.S (2015), "Handbook on Public Service Innovation", Access to Innovation (a2i) Programmme, Prime Minister's Office, Dhaka.

Mozumder, M.A. K. and Uddin, H. (2018), "Service Innovation in Bangladesh Police: Changes and Challenges", Journal of Sociology, Begum Rokeya University, Rangpur, Bangladesh, Vol-1, No-1, pp. 51-72.

OECD (2012), "Public-sector innovation", in OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012, OECD Publishing.doi: 10.1787/sti_outlook-2012-18-e

http://giupmo.gov.bd/

https://a2i.gov.bd/

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ওমর ফারুক
আইডি নং: ২১১২২৯১০০৫ , শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলার আকাশে তুমি ছিলে
এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা
তোমার জন্য আমরা কখনো
হইনিকো পথহারা!

তোমার জন্য বিশ্ব জেনেছে
বাংলাদেশের কথা
এ বিশ্বের বুকে চিরকাল রবে
তোমার কীর্তিগাথা।

ষোল কোটি বাঙ্গালীর
প্রাণের প্রিয় তুমি
তোমার জন্য আমরা পেলাম
স্বাধীন জন্মভূমি।

তোমার কীর্তি, তোমার মহিমা
কভু হবে না নিঃশেষ
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তুমি
তুমিই বাংলাদেশ।

তোমার স্মৃতি অন্তরেতে
করে আমরা ধারণ
শতবর্ষে শ্রদ্ধাভরে
তোমায় করি স্মরণ।

মঙ্গল অভিযান

ফারদিন ইসলাম
আইডি নং: ১৮১৪১০৮৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
ইকনোমিক্স বিভাগ

যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টারের বিশেষ এক ঘড়িতে সময় তখন টি-মাইনাস ২০ সেকেন্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। টেন, নাইন, এইট করতে করতে সংখ্যাটা ওয়ানে গিয়ে থামার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ, সাথে প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি। ২৭টি মার্লিন ইঞ্জিনের শক্তিতে দানবাকৃতির ফ্যালকন হেভি ছুটে চললো আকাশপানে।
এখন মনে হতে পারে, এ আর এমন কি? প্রতিনিয়তই তো কতশত রকেট মহাকাশে যাচ্ছে। তবে যদি বলা হয়, এই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণের পেছনে রয়েছে মানবজাতির শতবছরের স্বপ্নপূরণের আশ্বাস, ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক নয় কি? চলুন, এই স্বপ্নচারণের শুরু থেকে জেনে আসা যাক।

শুরুটা যেমন
আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এসেও প্রকৃতির কাছে আমরা এখনো যে ভীষণ অসহায়। দুর্যোগের অনিবার্যতার জন্য অনেক জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীরা মানবজাতিকে আন্তঃমহাকাশীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন। সম্পূর্ণ সৌরজগতে কেবল পৃথিবীই নয়, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও থাকবে মানুষের বসতভিটা- এইরকম একটা স্বপ্নের লক্ষ্যেই ছুটে চলেছেন অনেকে। এমনকি সদ্য প্রয়াত স্টিফেন হকিংসও তাঁর জীবদ্দশায় বার বার মানবজাতির বিনাশের আশঙ্কা করেছেন এবং খুব দ্রুতই এর সমাধান বের করার তাগিদ দিয়েছেন।

মঙ্গল কেন?
পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ৫৪.৪ মিলিয়ন কিলোমিটার। এত বিশাল দূরত্ব পার করতে একটি রকেটের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত জ্বালানি, ধারণক্ষমতা ও শক্তি। দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্বে এমন কোনো রকেট আবিষ্কৃত হয়নি যা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারবে। তবুও বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্বের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পাঠিয়েছেন স্পিরিট, কিউরিওসিটি, অপরচুনিটির মত বিভিন্ন রোভার।
বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, পুরো সৌরজগতে পৃথিবীর ন্যায় আবহাওয়া শুধু রয়েছে মঙ্গলে। তবে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৯৬ শতাংশ বায়ুর উপাদানই হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড মানবদেহের জন্য খুব ক্ষতিকর তবে উদ্ভিদের জন্য উপকারী। তাই মঙ্গলে বনায়ন করে তোলার দারুণ একটা পরিবেশ আছে এবং বনায়নের ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে অক্সিজেনের আধিক্যও লক্ষ করা যাবে।

পৃথিবী ও মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের ধরণ সাদৃশ্যপূর্ণ এবং উভয় গ্রহের উপরিপৃষ্ঠই তৈরি হয়েছে দাহ্য পদার্থ দিয়ে। এছাড়াও মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠ পৃথিবীর মত কয়েক ভাগে বিভক্ত এবং পৃথিবীর ন্যায় এর অভ্যন্তরেও একটি মূল অংশ রয়েছে। তাছাড়া মঙ্গলের মাটির খনিজ পদার্থ বনায়নের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মঙ্গলে পানি আছে কি না, এই প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। কেননা পানি থাকা-না থাকার উপরই নির্ভর করে মঙ্গল বসবাসযোগ্য কিংবা প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা। মঙ্গলে পানি থাকলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া-মস জন্মাতে পারবে এবং প্রাণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। নাসার তথ্যমতে, মঙ্গলে পানি রয়েছে!

মঙ্গলে ভবিষ্যৎ
এতদিন যাবৎ মঙ্গলে যাবার সকল পরিকল্পনা ছিলো নাসা (যুক্তরাষ্ট্র), রসকসমস (রাশিয়া) এবং আরো কিছু দেশের সরকারী মহাকাশ সংস্থাগুলোর। কিন্তু কয়েকবছর আগে বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ ব্যক্তিগত মহাকাশ সংস্থা নিজ উদ্যোগে মঙ্গল পাড়ি দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং তন্মধ্যে স্পেসএক্স অন্যতম।

মঙ্গলজয়ের অভিযানে নাসা একটু ধীরগতি পন্থা অবলম্বন করছে আপাতত। কেননা নাসা এখনও মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই ব্যস্ত সময় পার করছে। তাছাড়া মহাকাশ অভিযানের জন্য নাসার উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তিও বেশ ব্যয়বহুল।

২০১৮ সালে মঙ্গলের জলবায়ু ও অভ্যন্তরীণ নানা পরীক্ষা করার জন্য নাসা ইনসাইট রোভার প্রেরণ করে। ২০২০ সালে নাসা পরিচালনা করে "মার্স ২০২০" নামক এক মঙ্গল অভিযান, যেই অভিযানে পৃথিবী হতে নাসার "প্রিজারভেরেন্স" রোভার মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করেছে। এই রোভার প্রেরণের মাধ্যমে নাসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বসবাসের জন্য উপযুক্ত সকল প্রাকৃতিক উপকরণ খুঁজে বের করা। মজার একটি তথ্য হচ্ছে, এই রোভারের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে "ইনজেনুইটি" নামক একটি রোবোটিক (ড্রোন) হেলিকপ্টার। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে সফলভাবে উড্ডয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বাহিরের কোনো গ্রহে সর্বপ্রথম "পাওয়ার কন্ট্রোলড ফ্লাইট" এর ইতিহাস গড়ে এই ইনজেনুইটি।

ইলন মাস্কের নাম তো মোটামুটি আমরা সকলেই শুনেছি। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সফলতম বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা তিনি। তিনি মঙ্গল নিয়ে তার কোম্পানি স্পেসএক্সের পুরো পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং আশা ব্যক্ত করেন যে, স্পেসএক্সই সর্বপ্রথম মঙ্গলে কার্গো ও মনুষ্য মিশন পরিচালনা করবে। ধীরে ধীরে স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯, ড্রাগন ও সর্বশেষ ফ্যালকন হেভির মত অত্যাধুনিক মহাকাশযান উৎক্ষেপণ পরীক্ষা চালাতে লাগলো। তাছাড়াও স্পেসএক্স নির্মাণ করছে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম অত্যাধুনিক মহাকাশযান "স্পেসএক্স স্টারশিপ।" ধারণা করা হচ্ছে, এই স্টারশিপের কাঁধেই ভর করে আমাদের স্বপ্ন পাড়ি দেবে দূর মহাকাশে।

স্পেসএক্সের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালে মঙ্গলে তারা সর্বপ্রথম কার্গো প্রেরণ করবে, যেই কার্গোতে মূলত মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকার যাবতীয় সব উপাদান থাকবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৪ সালে স্পেসএক্স পরিচালনা করবে দ্বিতীয় মিশন, যার মাধ্যমেই মানবজাতির পদধূলি পড়বে লালচে মাটিতে। এই মিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে মঙ্গলে ভবিষ্যৎ মহাকাশযান ও মহাকাশচারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মঙ্গলের সম্ভাবনায় অমঙ্গল
আমরা চন্দ্রজয় করেছি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে। যেখানে সেই সত্তরের দশকের দিকে আমরা চন্দ্রজয় করেছি, যেখানে আজ এত বছর পরও চাঁদের গণ্ডি পেরোতে পারেনি মানবজাতি। কিন্তু এই স্থিরবছার কারণ কী? দেখে নেয়া যাক প্রধান তিনটি কারণ-

মহাকাশযান উৎক্ষেপণে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে খরচ। একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করতে গড়প্রতি আনুমানিক ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়। এই খরচের অধিকাংশ ব্যয় হয় রকেট নির্মাণে। প্রতিটি নতুন মহাকাশযান তৈরিতে প্রতিবার এত বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়, কারণ একটি মহাকাশযান তো একবারই ব্যবহার করা সম্ভব।

একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হওয়ার হাজারটি কারণ রয়েছে এবং সফলভাবে উৎক্ষেপণে রয়েছে মাত্র একটি কারণ। মহাকাশ সংস্থাগুলোর কাছে শতভাগ সফল উৎক্ষেপণের কোনো রেকর্ড নেই এবং গড়ে ২০ শতাংশ মহাকাশযান উৎক্ষেপণের ত্রুটিতে ধ্বংস হয়ে যায়। মহাকাশযানে মানুষ প্রেরণের সময় এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে বলেই এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠান

মঙ্গলের মত দূরবর্তী কোনো গ্রহে মানুষ প্রেরণ করতে পারেনি। তাছাড়াও এই ঝুঁকির কারণে ১৯৭২ সালের পর থেকে চন্দ্রে কেউ পা ফেলেনি।

সিনেমার পর্দায় মঙ্গল গ্রহের লালচে রঙের পরিবেশ, পাহাড়-পর্ব চিত্র দেখে মনে হতে পারে মঙ্গলের আবহাওয়া বুঝি তপ্ত কিংবা পৃথিবীর মত। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত মঙ্গলের আবহাওয়া হচ্ছে অত্যন্ত শীতল। একটি সাধারণ দিনেও মঙ্গলের আবহাওয়া শূন্যের বেশ কয়েকধাপ নিচে থাকে। তাছাড়া মঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত ধুলোঝড় হয়। এমন বৈরি আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলে মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষ

শুরুতে ফ্যালকন হেভির উৎক্ষেপণের কথা বলা হয়েছিলো। এর কারণ হচ্ছে, ফ্যালকন হেভি আধুনিক যুগের প্রথম নভোযান যা মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছাতে সক্ষম, একটি আস্ত বোয়িং-৭৪৭ এর ওজনের চেয়েও বেশি ওজনের কার্গো বহন করতে সক্ষম এবং এটি নবায়নযোগ্য অর্থাৎ উৎক্ষেপণের পরে এর ৩টি কুস্টার ইঞ্জিন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং বারবার ব্যবহার করা যাবে। এরফলে নভোযান উৎক্ষেপণের খরচ বিপুল হারে কমে যাবে। অর্থাৎ উপরের ৩টির মধ্যে ২টি গোলকধাঁধার সমাধান ছিল এই ফ্যালকন হেভি, যা পরবর্তীতে মঙ্গলজয়ের পথ কেবল সুগমই করবে না, টেকসইও করবে।

হয়তো নিকট ভবিষ্যতেই আমরা মঙ্গল জয় করে ফেলবো। সিনেমা কিংবা টিভিতে আমরা এতদিন যা দেখেছি, তাই হবে আমাদের অনেকের জীবনের দৈনন্দিনের কাহিনী। পৃথিবীর পাশাপাশি হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বসবাসের স্থান হবে ৩৩ মিলিয়ন মাইলের দূরবর্তী গ্রহ। সেদিন কিন্তু বেশি দূরে নয়!

তথ্যসংগ্রহ: নাসা, স্পেসএক্স, মার্স ওয়ান, ইউটিউব (ভিডিও ডকুমেন্টারি)

একা আমি

মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ
সহকারী পরিচালক
পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

ওই যে আমার ছোট্ট কুটির
লতায় পাতায় ছাওয়া,
পাশ দিয়ে যায় সোনা নদী
ভাঙ্গছে হিমেল হাওয়া।
ভোর বেলা সূর্য যখন
উঁকি মারে আকাশে
চোখ মেলে মনটা আমার
জুড়োয় নতুন আবেশে
সারাদিনের কর্ম শেষে
ক্লান্তি যখন ধরে এসে,
নদীর জলে নেয়ে এসে
মন জুড়াবে ভালবেসে।
নদীর পাড়ে একলা একা
মাছের সাথে কব কথা
হিমেল হাওয়া দিবে চুমে
উষা যখন পড়বে ভূমে,
উদাস চোখে তাকিয়ে র'ব
সূর্য যাবে আপন ধামে।
চাঁদ মামা আকাশেতে
আসবে যখন একা একা,
সঙ্গী হব চাঁদের আমি
কইব দুজন কত কথা।
শ্রান্ত-ক্লান্ত তনু আমার
আসবে যখন ধরে,
সব ভুলে গা এলাবো মন পবনের পাড়ে।

Fostering Leadership through Critical Thinking

Rahat Ahmed Shimanto
ID: 18251009, Session: 2017-18
Department of Business Administration in Marketing

A leader is someone who inspires people, directs, and leads them towards their goals. But not everyone can be a successful leader. A true leader is made, not born. Attaining true leadership is not a simple task. The ability of a leader or an individual to lead effectively relies on several skills. Some crucial skills needed to build successful leadership are critical thinking, innovation, management, communication, and emotional intelligence. And in the context of our world today and how everything gets shaped around us, critical thinking is a core skill needed for the leaders of our generation to excel proficiently. According to Henry Ford, "Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it." The statement succinctly signifies thinking critically. Leadership and critical thinking go hand in hand in the context of the modern era.

According to Peter Drucker, "Management is doing things right, leadership is doing the right things." In simple terms, critical thinking is the ability of human beings to think clearly and consistently by creating logical connections between ideas and information. A true leader portrays utmost trust and conducts proper judgment by making strategic decisions and earns the confidence of his people. But instilling effective leadership is not an easy process. For the leaders of today, critical thinking is a must-have attribute. A leader must exhibit his worth or credibility through his decisions, actions, and philosophy. Effective leadership gets analysed in times of complexities through how a leader acts and uses logics to eradicate the adversity in focus. Hence, critical thinking infuses leaders to take the right steps.

We live in an era of continuous disruption, innovation, and adoption. In this rapidly changing world, conventional thinking, ideologies, and attributes of leadership cannot guarantee a better tomorrow, and thus there is a dominant need for effective leadership. But there are many stakes involved in leadership roles. Often a leader has to make decisions that can bear a critical impact on his followers or nation. In such situations, it is not easy to determine the best solution. A true and competent leader must analyse complex issues with utmost concern, remain unbiased, and focus on the wellbeing of his people. Furthermore, complex situations may even bring issues that can clash with the leader's views or principles; but the leadership role urges to be impartial at all costs and act sensibly to deliver the best decision. Complex issues or dilemmas in the modern context have been very well managed by capable leaders worldwide by thinking critically and generating positive and sustainable results.

We have had many intelligent leaders who could sprout brilliant answers to problems but often made questionable or uncertain decisions or remarks due to the absence of or low emphasis on critical thinking. In today's fast-changing and highly competitive world, the dangers of poor decisions are more severe than ever. At times, leaders cannot rely on what has worked in the past, as the challenges they are facing are ever-changing. Thus, the leaders must adequately analyse options and potential consequences and promptly adjust to new strategies and approaches to ensure consistency in making the right decisions. Critical thinking can greatly support leaders in attaining such competency.

Critical thinking is paramount to a leader's success, especially in an ever-changing and increasingly complex world. Several studies and surveys conducted globally identified critical thinking as the prime requirement for successful leadership in the 21st century. Yet, there is high evidence that many current and emerging leaders lack this quality. The world -renowned magazine Forbes has revealed that there are seven critical thinking tactics that high-performing leaders use to make informed decisions and they are, being open-minded and curious, being an observer and listening carefully, reflecting on learnings, garnering new knowledge and experiences, talking with others for gaining different perspectives, brainstorming, and evaluating the opinions, judgements, and decisions of others. In this generation of emerging leaders, only a select number is seen to be sufficiently prepared and willing to exercise the critical thinking required of them to lead successfully. Leaders such as Angela Merkel, Jacinda Ardern, and Mahathir Mohamad can be praised as exceptional leaders who have displayed their remarkable results and critical thinking ability through their decisions over time. Especially, recently in 2020, Jacinda Ardern, the honourable Prime Minister of New Zealand, through her actions of compassion with the family of victims of the Christchurch attack, amendment of laws, interactivity with people, and deploying effective measures to curb the spread of the coronavirus exemplified her remarkable thinking and reasoning ability as a leader. It serves as a wonderful example of how critical thinking can build resilient communities through effective leadership. Her critical thinking ability led to developing strategic decisions and actions and ultimately brought New Zealand success in limiting the spread of the coronavirus as well and earned her global admiration for her strong and successful leadership.

Today, the world requires leaders to think differently, and critical thinking is highly essential in this regard. Acquiring critical thinking is not too daunting of a task. It is a skill that can be developed without any hurdles. The world-renowned magazine Forbes has revealed that there are seven critical thinking tactics that high-performing leaders use to make informed decisions and they are, being open-minded and curious, being an observer and listening carefully, reflecting on learnings, garnering new knowledge and experiences, talking with others for gaining different perspectives, brainstorming, and evaluating the opinions, judgements, and decisions of others. It is a must-have quality for the leaders of today and the future. A leader who exhibits leadership adopting critical thinking has the highest potential to bring good to the world.

References

Kasowski, D. (2020, November 04). Council Post: Seven Critical Thinking Tactics High-Performing Leaders Use To Make Informed Decisions. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/11/03/seven-critical-thinking-tactics-high-performing-leaders-to-make-informed-decisions/?sh=daf081824f72 Sanscartier, M. (2021). Leadership – The Importance of Critical Thinking | March Fifteen Consulting. Retrieved 14 August 2021, from https://www.marchfifteen.ca/leadership-the-importance-of-critical-thinking/

শ্রমিকের চোখে ইতিহাস

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ

থীবসের সাতটা ফটক, কে বানালো বলো?
তোমরা বলো, বলতে পারো?
কেতাব ভরা রাজার নামে
কোন সে রাজা, পাথর টানে?
দেখ, ব্যাবিলন ভাঙে শত শত বার
কে গড়ে তাকে সময়ে আবার?
বলো, কোথায় থাকে এই কারিগর?
স্বর্ণ-শহর লিমা, জায়গা তাকে দিলো?
এক আজব সন্ধ্যায়
প্রাচীর হল হায়
বলো, চীনের শ্রমিক
কোথায় হারায়?
রোমের বাদশাহি ধনুকের গান
কে রাখিল ধরে পরম আদর করে?
সিজারের জয়গান হয় কাদের 'পরে?
হায় রে বাইজেনসিয়াম,
কি সুন্দরে বেঁচে থাকে গানে
প্রতিটি ঘর যেন মহলের ঘ্রাণে
ছিল না কেউ কোন কুটিরে?
যাদুর শহরে পৌরানিক দ্বীপে
গভীর রজনীতে এখনো প্রলয় হানে
ডুবন্ত জীব কেন দাসের নামে কাঁদে?
মহাবীর আলেকজান্ডার, মহাপ্রতাপ সিজার,
ফিলিপ কিংবা মহাযোদ্ধা ফ্রেডরিক
উড়িয়েছে বিজয় নিশানা কত

মূল: বেরটল্ট ব্রেখট, জার্মান নাট্যকার ও কবি
অনুবাদ: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

ছিল কি তারা একা?
পাই না কেন এই ইতিহাসে
অন্য জনের দেখা?
প্রতিটি পাতায় বিজয়গাঁথা
কার কাফনে মোড়ানো কাঁথা?
প্রতি দশকে দেখ মহাবীর হাসে
কে বাজালো বাঁশি?
কোথায় লিখা আছে, কোন ইতিহাসে?
কত আজব এই ধরা
বিচিত্র বয়ানে ভরা
সহজ প্রশ্ন
আপন তথ্য
থাকে অজানা, থাকে অচেনা।

রক্তের বন্ধনে গড়ি নতুন সমাজ

তোফায়েল আহমেদ
সহকারী পরিচালক
অফিস অব দ্য গ্লোবাল স্ট্রাটেজিক

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টিকর্তার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দর সৃষ্টি এই মানুষ। অত্যন্ত সৌন্দর্যময় ও পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মানুষকে। সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে দুর্বলতম প্রাণি। তাইতো জীবিত অবস্থায় নিজেকে পৃথিবীর আলো, বাতাস, প্রকৃতি ও সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষ নিজেকে যুক্ত করে নানা মায়া মমতার বন্ধনে। এ বন্ধন গড়ে ওঠে মায়া মমতার ভিত্তিতে, ভালোবাসার ভিত্তিতে, আত্মীয়তার ভিত্তিতে আবার কখনো দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে। এ বন্ধন গঠনে রয়েছে কতশত সীমাবদ্ধতা। রয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী-গরীবের বিস্তর ফাঁরাক। তাই এই বন্ধনে মাঝে মাঝে কারণে অকারণে চিড় ধরে। আসে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো বড় বড় সব আঘাত। ফলে নিমিষেই ভেঙ্গে যায় এ বন্ধন । ভাঙ্গা গড়ার এই জগত সংসারে 'রক্তের বন্ধন' সৃষ্টি করতে পারে এক নতুন সমাজের যার ভিত্তি হবে মানবতা, মানবপ্রেম। যেখানে থাকবেনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী-গরীবের কোন ভেদাভেদ। সমাজ হবে সুখের, মানুষ বাঁচবে স্বপ্ন নিয়ে। ঘর বাধঁবে নতুন আশায়।

রক্তের পরিচিতি

সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি রক্ত হলো লাল বর্ণের তরল পদার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় রক্তের পরিচয় অনেক বিস্তৃত।

বিজ্ঞানের ভাষায় রক্ত হচ্ছে প্লাজমা (রক্তরস) ও প্লাজমায় ভাসমান বিভিন্ন কোষীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত লাল বর্ণের তরল যোজক কলা। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে গড়ে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে যা দৈহিক ওজনের প্রায় ৮%। রক্তের স্বাদ লবণাক্ত, সামান্য ক্ষারীয় কেননা রক্তের পিএইচ এর মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫। রক্তের তাপমাত্রা ৩৬-৩৮০ সেলসিয়াস। অস্থিমজ্জা, লিভার ও কিডনী থেকে তৈরি এই রক্ত মানব শরীরে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। রক্ত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা। রক্তে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা (লোহিত রক্তকণিকা), প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (শ্বেত রক্তকণিকা), রক্ত জমাট বাধার উপাদান (অনুচক্রিকা)। এছাড়া রক্তের প্লাজমাতে থাকে সব ধরনের শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব আয়ন, প্রোটিন, হরমোনসহ নানা প্রকার কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট। রক্ত শরীরের সব প্রান্তে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিবহন করে এবং শরীর থেকে সব ধরনের বর্জ্য পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে। শরীরের সব ধরনের কেমিক্যাল উপাদান, রোগের উপশমের জন্য সেবনকৃত ওষুধ এবং রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুও এই রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়। রক্তের প্রতিটি উপাদান একজন রোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর জন্য রক্তের প্লাটিলেটের প্রয়োজন হয়, আগুনে পোড়া রোগীর জন্য রক্তের প্লাজমা প্রয়োজন হয়, করোনা রোগীর চিকিৎসায় প্লাজমা প্রয়োজন এবং অন্যান্য স্বাভাবিক রোগে রক্ত শূন্যতা দেখা দিলে সাধারণ রক্ত প্রয়োজন হয়।

রক্তদান কী

রক্তদান হল কোনো একজন সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেবার প্রক্রিয়া। রক্তের অভাবে বা রক্ত শূন্যতায় মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তিকে আপন শরীরের রক্তদানের মাধ্যমে বেঁচে থাকার আশার আলো জাগানোর এক মহৎ কাজ এই রক্তদান। এই দান করা রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অথবা অংশীকরণের মাধ্যমে ঔষধে পরিণত করা হয়। উন্নত দেশে বেশিরভাগ রক্তদাতা স্বেচ্ছায় ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রক্তদান করেন। দরিদ্র দেশগুলোতে এ ধরণের স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বেশ কম, বেশিরভাগ রক্তদাতাই কেবল তাদের পরিচিতজনদের প্রয়োজনে রক্তদান করে থাকেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচিতজনরাও সাড়া দেয় না। বেশির ভাগ রক্তদাতাই সমাজসেবামূলক কাজ হিসেবে রক্তদান করেন, তবে কিছু মানুষ পেশাদার রক্তদাতা অর্থাৎ তারা অর্থ বা কোন ভাতার বিনিময়ে রক্তদান করে থাকেন। আবার রক্তদাতা তার ভবিষ্যত প্রয়োজনে রক্ত পেতে পারেন এই ভেবেও রক্তদান করে থাকেন। সম্ভাব্য রক্তদাতার রক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব কারণে রক্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তার সবকিছুই পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ (যেমন এইচআইভি ও ভাইরাল হেপাটাইটিস) এর পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত। রক্তদাতাকে তার চিকিৎসার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা হয় এবং একটি সংক্ষিপ্ত শারীরিক পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয় যে, রক্তদাতার রক্ত গ্রহীতার জন্য ক্ষতিকর হবে না। একজন রক্তদাতা কতদিন পরপর রক্তদান করতে পারবেন তা নির্ভর করে তিনি রক্তের কী উপাদান দান করছেন তার ওপর এবং যে দেশে রক্তদান সম্পন্ন হচ্ছে সে দেশের আইনের উপর । তবে প্রতি চারমাস অন্তর (১২০ দিন) একজন সুস্থ মানুষ রক্তদান করতে পারেন। কেননা মানবদেহে ১২০ দিন পর পূর্বে উৎপাদিত রক্ত নষ্ট হয়ে নতুন রক্ত তৈরি হয়।

ছবি: গুগল থেকে সংগৃহীত

রক্তদানের ইতিহাস

১৪৯২ সালে অষ্টম পোপ যখন স্ট্রোক করে তখনকার চিকিৎসকরা ধারণা করেছিল, পোপের শরীরের কোথাও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই ভেবে পোপকে বাঁচানোর জন্য দশ বছর বয়সের তিনজন ছেলের শরীর থেকে রক্ত বের করে পোপকে পান করানো হয়েছিল। যেহেতু তখন রক্তনালী বলে কিছু আছে, সেটাই জানা ছিল না। তাই সবাই ভাবতো রক্ত খেলেই সেটা শরীরে ঢুকে পড়বে। মাত্র একটা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সেই তিন বাচ্চার রক্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলো- রক্ত নেয়ার ফলে তিনটা বাচ্চাই মারা যায়। কিন্তু পোপ বেঁচে যায়। তারপর সবাই ধারণা করেছিল, সেই রক্তের জন্যই পোপ বেঁচে গেছে। পরের বছর পোপ সেকেন্ড স্ট্রোক করে মারা যায় কোনো ঘোষণা ছাড়াই। প্রায় ১৭০ বছর পর ডেনিস নামে এক লোক ভেড়ার রক্ত মানুষের শরীরে প্রবেশ করায়। রি-একশন হয়ে মারা যান সেই ব্যক্তি। এরই মধ্যে বিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যাভে কর্তৃক ব্লেজ সিভিএস সিস্টেম উদ্‌ঘাটনের পর রক্তের সকল প্রবাহের বিষয়টি তখন মনুষ্য জগতের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৬৮০ সালের দিকে আইন করে Animal-Human রক্ত দেয়া বন্ধ করা হয়, কারণ সাকসেস হওয়ার কোনো ডকুমেন্ট ছিল না। ধীরে ধীরে মানুষ রক্তের গুণাগুণ জানতে শুরু করে। অবশেষে ১৮১৮ সালে জেমস ব্যান্ডেল নামের একজন চিকিৎসক প্রথম সফলভাবে মানুষ থেকে মানুষে রক্ত সঞ্চালন করেন। যদিও তিনি তখন ABO Blood group এবং Rh group সম্পর্কে জানতেন না । প্রথম রোগী ছিল- এক মা, যার ডেলিভারির পর প্রচণ্ড Postpartum Hemorrhage হয়েছিল। তাকে নিজের স্বামীর রক্ত দেয়া হয়েছিল। ১৯০১ সালে কার্ল ল্যান্ডিস্টেইনার ABO Blood group system আবিষ্কার করেন। এছাড়া করেই রক্তের রং অভিন্ন হলেও ভিতরে এর বৈশিষ্ট্য ভিন্নতার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি ১৯৪০ সালে আবার Rh group আবিষ্কার করেন, যার ফলে আমরা এখন পজিটিভ নেগেটিভ রক্ত বুঝতে পারি। ১৯২৬ সালে রেড ক্রস প্রথম ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস চালু করেন ইংল্যান্ডে। ১৯১৪ সালে রক্তের মধ্যে প্রথম এন্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করেন হস্টন, যেন রক্ত জমাট না বাঁধে। ১৯৪১ সাল থেকে রক্তদানের জন্য Donor System চালু হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে রক্তদানের আগে সিফিলিস টেস্ট করা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে আমেরিকায় প্রথম ব্লাড ব্যাংক সিস্টেম চালু হয়।

রক্তদান করা কেন প্রয়োজন

দুর্ঘটনায় আহত, ক্যান্সার বা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্তদের জন্য, অস্ত্রোপচার কিংবা সন্তান প্রসব অথবা থ্যালাসেমিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় জরুরি রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এই সঙ্কটকালীন সময়ে রোগীর সাথে সাথে আত্মীয় স্বজনরাও পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়েন। ঐ মুহূর্তে একজন রক্তদাতাই কেবল তাদের সবার আশার আলোকবর্তিকা হতে পারেন। তবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় রক্তদাতার সংখ্যা এখনো নগণ্য। আমাদের দেশের রক্তদাতাদের প্রধান উৎস হলো রিপ্লেসমেন্ট ডোনার বা রিলেটিভ ডোনার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বছরে প্রায় আট লাখ ইউনিট বা ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় সাত লক্ষ ব্যাগ বা ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। চাহিদার তুলনায় ঘাটতি প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ ইউনিট রক্ত। এছাড়া সংগ্রহকৃত রক্তের মাত্র ৩১ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের নিকট আর বাকিটা রিপ্লেসমেন্ট ডোনার বা রিলেটিভ ডোনারের মাধ্যমে আসে। বিশ্বের প্রায় ৬২ দেশে শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উন্নত বিশ্বে স্বেচ্ছায় রক্তদানের হার প্রতি হাজারে ৪০ জন এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি হাজারে ৪ জনেরও কম। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে রক্তের চাহিদা বেশি থাকলেও স্বেচ্ছায় রক্তদাতার হার অনেক কম। আমাদের বেশির ভাগ মানুষের মনে রক্তদানের ক্ষেত্রে 'ভয়' বাধা হিসেবে কাজ করে। দেশের প্রত্যেক মুমূর্ষু রোগীর জন্য প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসা। কারণ নিরাপদ রক্ত সরবরাহের মূল ভিত্তি হলো স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদান। একব্যাগ রক্ত দিয়ে শুধু একটি নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে তিনটি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। কেননা এক ব্যাগ রক্তকে এর উপাদান- জবফ Blood Cell, Platelet & Plasma or Cryoprecipitate. হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করে তিনজনের দেহে সঞ্চালন করা সম্ভব। তাই এক ব্যাগ রক্ত ক্ষেত্র বিশেষে বাঁচাতে পারে তিনটি প্রাণ। দেশে একবার রক্তদাতার সংখ্যা বেশি থাকলেও বহুবার রক্ত দিয়েছেন এমন রক্তদাতার হার অনেক কম। আমরা যদি রক্ত নাও দান করি তারপরও সে রক্ত আমাদের শরীরে জমা থাকে না। কারণ রক্তের যিনি মূল কারিগর তিনি এমন রুটিন তৈরি করে রেখেছেন যাতে করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (Normal Physiological Process) এই রক্ত ১২০ দিন পর পর নষ্ট হয়ে শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থরূপে বের হয়ে যায়। তাই আপনি যদি নিয়মিত রক্তদান করেন তবে একজন মুমূর্ষু মানুষের শরীরে আপনার দান করা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আপনার দেওয়া এক ব্যাগ রক্তের কারণে একটি জীবন প্রদীপ জ্বলতে আশা পায়। আপনার দেওয়া এক ব্যাগ রক্তই একটি মুমূর্ষু জীবনের বেঁচে থাকার পরিধি বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। সেইসব মুমূর্ষু মানুষগুলো যদি আপনার দেওয়া রক্তের মাধ্যমে সুস্থ উঠে, তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্তদাতার জন্য তার মনের গহীন থেকে দোয়া-আশীর্বাদ করে যায়, হয়ত সেটা তার নিজেরও অজান্তে। একজন রক্ত দাতার রক্ত অন্যের শরীরে প্রবাহিত হয়ে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখছে, এর চেয়ে উত্তম মানবিক কাজ এই ধরণীতে আর কি হতে পারে? এজন্যই নিয়মিত রক্তদান করা আবশ্যক।

রক্তদানের যোগ্যতা

সাধারনত একজন সুস্থ ব্যক্তি প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর রক্তদান করতে পারেন। তবে রক্তদানের ক্ষেত্রে একজন রক্তদাতার কিছু সাধারণ যোগ্যতা বা শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। একজন রক্তদাতার রক্তদানের সামগ্রিক যোগ্যতাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- রক্তদাতা কে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ও নিরোগ ব্যক্তি হতে হবে।
- ১৮ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যেকোনো সুস্থদেহের মানুষ রক্তদান করতে পারবেন।
- রক্তদাতার ওজন অবশ্যই ১০০ পাউন্ড বা ৪৭ কিলোগ্রাম কিংবা তার বেশি হতে হবে।
- রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে।
- কোন বিশেষ ধরনের ঔষধ সেবন না করলে। যেমন-এ্যান্টিবায়োটিক।
- রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ (৭৫%) ১২.০ গ্রাম/ডিএল (পুরুষ), ১১.০ গ্রাম/ডিএল (মহিলা) থাকলে।
- কোন দুর্ঘটনা বা বড় ধরনের অপারেশন না হলে। রক্তবাহিত জটিল রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস এর মতো যৌন রোগ, হেপাটাইটিস , ম্যালেরিয়া, চর্মরোগ , হৃদরোগ , ডায়াবেটিস , টাইফয়েড এবং বাতজ্বর না থাকলে। তবে কিছু রোগে আক্রান্ত রোগীরা নির্দিষ্ট সময় পর রক্ত দিতে পারেন। যেমন, টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগী ১২ মাস, ম্যালেরিয়ার রোগী ৩ মাস পর রক্ত দিতে পারবেন।
- নাড়ীর গতি ৬০-১০০/ মিনিটের মধ্যে থাকলে।
- শরীরের তাপমাত্রা ৯৭-৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মধ্যে থাকলে।
- শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ এ্যাজমা, হাপানি না থাকলে রক্ত দিতে পারবেন।

- চার মাসের মধ্যে রক্তদান না করলে।
- মহিলাদের মধ্যে যারা গর্ভবতী নন এবং যাদের মাসিক চলছে না।

যাদের রক্তের প্রয়োজন

- দুর্ঘটনাজনিত কারণে মারাত্মকভাবে আহত রোগীর জন্য দুর্ঘটনার তীব্রতা অনুযায়ী রক্তের প্রয়োজন হয়।
- দগ্ধতা - আগুনে পুড়া বা এসিডে ঝলসানো রোগীর জন্য প্লাজমা/রক্তরস প্রয়োজন। এজন্য ৩-৪ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন।
- অ্যানিমিয়া হলে। রক্তের ডিজঅর্ডার কে বলা হয় অ্যানিমিয়া। রক্তে জ.ই.ঈ. এর পরিমাণ কমে গেলে রক্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ হিমোগ্লোবিনের অভাবে অ্যানিমিয়া রোগ হয়। হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াতে জ.ই.ঈ. এর ভাঙ্গন ঘটে। অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর জন্য ঘন ঘন রক্তের প্রয়োজন পড়ে।
- থ্যালাসেমিয়া হলে। থ্যালাসেমিয়া হলো এক ধরনের হিমোগ্লোবিনের অভাবজনিত বংশগত রোগ। থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীকে প্রতিমাসে ১-২ ব্যাগ রক্ত দিতে হয়।
- হৃদরোগের সার্জারি হলে। হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর Heart Surgery I Bypass Surgery এর জন্য ৬-১০ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন।
- হিমোফিলিয়া হলে। হিমোফিলিয়া এক ধরনের বংশগত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তক্ষরণ হয় যা সহজে বন্ধ হয় না, তাই রোগীকে রক্ত জমাট বাধার উপাদান সমৃদ্ধ চষধঃবষবঃব দেয়া হয়।
- প্রসবকালীন রক্তক্ষরণ হলে। প্রসবকালীন সময়ে সাধারণত প্রয়োজন হয় না তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে ১-২ বা ততোধিক ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়।
- ব্লাড ক্যান্সার হলে। রক্তের উপাদানসমূহের অভাবে ক্যান্সার হয়। প্রয়োজন অনুসারে রক্ত দেয়া হয়।
- কিডনী ফেইলিওর রোগীর কিডনী ডায়ালাইসিস এর সময় মাঝে মাঝে রক্তের প্রয়োজন হয়।
- রক্ত বমি হলে। এ রোগে ১-২ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়।
- ডেঙ্গু জ্বর হলে। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে প্রয়োজন অনুসারে ৪ ব্যাগ রক্ত হতে ১ ব্যাগ চষধঃবষবঃব পৃথক করে রোগীর শরীরে দেয়া হয়।
- অস্ত্রপচার করা হলে। রোগীর অস্ত্রপচারের ধরণ বুঝে রক্তের চাহিদা বিভিন্ন।

রক্তদানের পর করণীয়

ছবিঃ লায়ন্স ভবনে প্রথমবার স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন লেখক

রক্ত আমাদের হৃদপিন্ডের সাহায্যে সমস্ত শরীরে চক্রাকারে সঞ্চালিত হতে থাকে। সাধারণত একজন রক্তদাতার শরীর থেকে প্রতিবার রক্তদানের সময় ৪৫০ মিলিলিটার রক্ত নেওয়া হয়। রক্ত নেওয়ার পর যেহেতু সাধারণত রক্তের ঘাটতি থাকে এবং রক্তের সাথে আয়রনও কমে যায় তাই রক্ত দেয়ার পর ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা শারীরিক অসুবিধা কারো কারো দেখা দিতে পারে। যেমনঃ মাথা ঘুরানো, বমি বমি ভাব আসা, হাত পায়ে দুর্বল অনুভব করা ইত্যাদি। আর এই শারীরিক অসুবিধাগুলো স্বাভাবিক। রক্তদানের পর যদি রক্তদাতা ১৫-২০ মিনিট সময় কিছু নিয়ম মেনে চলেন তবে এই সমস্যা মোটেই দেখা দেওয়ার কথা নয়। যেমনঃ রক্তদানের পর ১০-১৫ মিনিট শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া খুবই জরুরি কেননা এই সময়ে সমস্ত শরীরে ঘাটতি রক্তের ভারসাম্য তৈরি হয়ে যায়। তাই রক্তেদানের পর চটজলদি বেড থেকে ওঠে না পড়া, দৌড়ে কোথাও না যাওয়া, লম্বা সিড়ি বেয়ে উপরে না ওঠাই ভালো। রক্তদানের পর বেশি হাঁটাহাঁটি না করে অন্তত এক থেকে দুই ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের হেমাটোলজি বিভাগের প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম। রক্তদাতা যদি ঘামতে থাকেন এবং অস্থিরতা হয়, তবে তাকে স্যালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। রক্ত দেয়ার পর লোহিত রক্তকণিকার মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে অন্তত এক থেকে দেড় মাস সময় লাগে বলে উল্লেখ করেন ড. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, রক্ত দেয়ার সময় শরীর থেকে রক্তের পাশাপাশি ২৫০-৩০০ মিলিগ্রাম আয়রন কমে যায় তাই তার ক্ষয়পূরণে আয়রন ও প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি বেশি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

রক্তদানের সুবিধা

রক্তদানের মাধ্যমে রক্তের অভাবে মৃতপ্রায় একজন মানুষের জীবনের বাঁচানোর মধ্যদিয়ে মনের প্রশান্তি ছাড়াও নিয়মিত রক্ত দেয়ার কিছু উপকার রয়েছে। রক্তদানের উল্লেখযোগ্য উপকারি দিকগুলো হলো:

- রক্তদানের মাধ্যমে একটি জীবন বাঁচানোর মতো পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানব সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাওয়া যায়।
- মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি মেলে।
- রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের 'বোন ম্যারো' নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং রক্তদানের ২ সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্তকণিকার জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। আর বছরে ৩-৪ বার রক্তদানকারীর শরীরে লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বেড়ে যায়।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অনেকগুন বেড়ে যায়।
- নিয়মিত রক্তদানে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে বলে হৃদপিন্ড বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
- নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক কম থাকে।
- স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে আপনি বিনামূল্যে (যেহেতু রক্ত গ্রহণের পূর্বে রক্তের চাহিদাকারী আপনার রক্তের প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফি প্রদান করে থাকেন) জানতে পারেন আপনার শরীর রক্তবাহিত মারাত্মক রোগ যেমন-হেপাটাইটিস-বি, এইডস, সিফিলিস ইত্যাদির জীবাণু বহন করছে কি না।
- রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা কমে যায়, এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।
- রক্ত দিলে যে ক্যালোরি খরচ হয়, তা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- সম্প্রতি ইংল্যান্ডের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী জটিল বা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন।

রক্তদানে নেই কোনো ধর্মীয় বাঁধা

রক্তদান ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত পুণ্যের বা সওয়াবের কাজ। রক্তদানের ব্যাপারে ইসলামে কোনো ধরণের বিধি-নিষেধ নেই। তবে রক্ত বিক্রি বৈধ না হলেও বিনামূল্যে রক্ত না পেলে রোগীর জন্য রক্ত কেনা বৈধ। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ তার আপন ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে' (মুসলিম)। 'একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ' (সূরা মায়েদা: ৩২)।

রক্তাদানের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা

আমাদের দেশে বর্তমানে রক্তের চাহিদার তুলনায় রক্তদাতার সংখ্যা এখনো অপর্যাপ্ত। দেশের জনসংখ্যার কথা বিবেচনায় নিলে এই ঘাটতি মোটেও থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা সত্যিই ভিন্ন। স্বেচ্ছায় রক্তদানের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা মানুষ বিজ্ঞানের এই যুগেও মনের মধ্যে পোষণ করে যা রক্তদানের পথে অন্তরায় বলে মনে হয়। যেমন:-

- রক্তদান? আমাকে দিয়ে হবে না। রক্ত আর সুচ - দেখলেই ভয় লাগে... তাছাড়া রক্তদান নিরাপদ না।
- রক্তদান করলে দুর্বল হয়ে যাবো।
- "সারাদিন অনেক ব্যস্ত আছি, ভাই... রক্ত দানের সময় কই?"
- "আমি একজন রক্তদান করলেই কি বা না করলেই কি? কি এমন তফাৎ হচ্ছে?"
- "আমি হাজার হাজার টাকা দান করি গরীব মানুষদের, রক্তদান করতে হবে এমন কোনো কথা নাই"
- অনেকের রক্তদান করার সময় ব্যথা পাওয়ার ভয় কাজ করে। রক্ত নেওয়ার সূচ অনেক মোটা, সূচ ফোটালে সহ্য করতে পারবেনা ইত্যাদি।
- অনেকে আবার মনে করেন রক্তদানের পর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। রক্তদান করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে।
- অনেকে মনে করেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত দিতে পারবে না - এটিও ভুল ধারণা। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি ততক্ষণ রক্তদান করতে পারবেন, যতক্ষণ ওই ব্যক্তির রক্তের গ্লুকোজ লেভেল স্বীকৃত সীমার মধ্যে থাকবে।

- রক্তদান করলে দুর্বল হয়ে যাবো।
- "সারাদিন অনেক ব্যস্ত আছি, ভাই... রক্ত দানের সময় কই?"
- "আমি একজন রক্তদান করলেই কি বা না করলেই কি? কি এমন তফাৎ হচ্ছে?"
- "আমি হাজার হাজার টাকা দান করি গরীব মানুষদের, রক্তদান করতে হবে এমন কোনো কথা নাই"
- অনেকের রক্তদান করার সময় ব্যথা পাওয়ার ভয় কাজ করে। রক্ত নেওয়ার সূচ অনেক মোটা, সূচ ফোটালে সহ্য করতে পারবেনা ইত্যাদি।
- অনেকে আবার মনে করেন রক্তদানের পর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। রক্তদান করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে।
- অনেকে মনে করেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত দিতে পারবে না - এটিও ভুল ধারণা। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি ততক্ষণ রক্তদান করতে পারবেন, যতক্ষণ ওই ব্যক্তির রক্তের গ্লুকোজ লেভেল স্বীকৃত সীমার মধ্যে থাকবে।
- কেউ কেউ মনে করে উচ্চরক্তচাপের কারণে রক্তদান করা যায় না - এটিও ভুল ধারণা। রক্তদানের সময় ব্লাড প্রেসার ১০০ মি. মি-১৬০ মি. মি সিস্টোলিক ও ৬০-১০০ মি. মি ডায়াস্টোলিকের মাঝে থাকলে রক্ত দেওয়া যায়।
- এছাড়া গ্রামে রক্তদানের ক্ষেত্রে অভিভাবক, প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধব নিরুৎসাহিত করে থাকেন। তাদের রক্তদান করার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তারা রক্তদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তাই রক্তদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে মুমূর্ষ রোগীর অসহায়ত্ব অনুভবের মাধ্যমে। একজন রোগী একবার বলেছিলেন "You don't know how important donating blood is until you're sick." আমরা চাই তার কথা ভুল প্রমানিত হোক... আসুন, রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে শিখি মুমূর্ষু রোগীর অসহায়ত্ব অনুভবের মাধ্যমে।

রক্তদাতাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

যারা স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদান করে সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন, পর্দার আড়ালে থাকা সেসব মানুষকে আন্তর্জাতিক দরবারে পরিচয় করিয়ে দিতে প্রতিবছর ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালিত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস পালন করা হয়। নিয়মিত রক্তদাতাকে সম্মান জানাতে এবং রক্তদানে ভয় দূর করতে প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিবসটির একটি করে নতুন প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'Give blood and make the world a healthier place'।

প্রয়োজন শুধু সচেতনতা

পৃথিবীতে অনেক মহৎ কাজ রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম মহৎ কাজ হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান। কারণ রক্ত কোনো ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন করা যায় না। রক্ত কেবল একজন মানুষের প্রয়োজনে আরেকজন মানুষ দিতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে রক্তের চাহিদার তুলনায় প্রায় এক/দেড় লাখ ইউনিট রক্তের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে প্রয়োজন শুধুই সচেতনতা। আমরা যদি একটু সচেতন হই তবেই এ ঘাটতি সহজে পূরণ করা সম্ভব। কেননা কেউ রক্ত না দিলেও তা কিন্তু তার শরীরে জমা থাকছে না। একটি নির্দিষ্ট সময় পর সেটি শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতি তিন মাস পরপর শরীরের রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং আবার নতুন রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়। তাই প্রতি ৪ মাস অন্তর ১ ব্যাগ রক্ত যে কেউ সহজেই দান করতে পারেন। রক্তের চাহিদা পূরণের জন্য নিজে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দান করা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ একটি কার্যকরী উদ্যোগ হতে পারে। তাছাড়া নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এ বিষয়ে প্রচারপত্র প্রকাশ করা, উদ্বুদ্ধকরণ স্টিকার প্রকাশ, পাবলিক প্লেসে লিফলেট বিতরণ, বিভিন্ন সময় সেমিনার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট অফিসে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাসপাতালে রক্তাদানের পর রক্তদাতাকে হাসপাতালের পক্ষ থেকে সম্মান স্বরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আমাদের দেশেও যদি সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল গুলোতে রক্তদাতাকে এ ধরণের ব্যতিক্রমী সম্মানে সম্মানিত করা হয় তবে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাগণ রক্তদানে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়।

রক্তদানের পর করণীয়

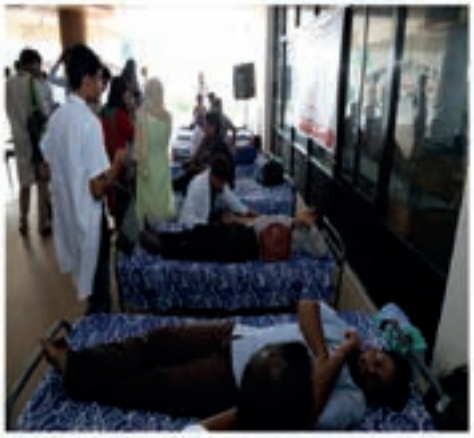

ছবি: বিইউপতে স্বাধীনতা দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন (PRI&P-হতে সংগ্রহিত ছবি)

তরুনরা সর্বকালেই জাতি গঠনের কান্ডারি ছিল। তাদের হাতেই জাতির ভবিষ্যত। তাই একটি সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলাতে তরুনদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজে বাঁধন, সন্ধানী, জীবন, কোয়ান্টাম মেথডসহ একাধিক স্বেচ্ছায় রক্তদানের সংগঠন গড়ে ওঠেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগোপযোগী কাজ। আর এই সংগঠনগুলোর চালিকাশক্তি হলো আমাদের তরুনেরা। স্বেচ্ছায় রক্তদানের কার্যক্রমকে একটি আন্দোলনে রূপ দিতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুনদের সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তদানের কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারলেই বাংলাদেশের বার্ষিক রক্তের চাহিদা শতভাগ পূরণ করা সম্ভব হবে। আমরা গড়তে পারবো রক্তের বন্ধনের এক নতুন সমাজ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার রক্তই লাল। এর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। মানুষের শরীরে রক্তের প্রয়োজনীয়তা এতা বেশি যে, রক্ত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে পারে না। মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে প্রায়ই জরুরি রক্তের প্রয়োজন হয়। সামান্য পরিমাণ রক্তদানের মাধ্যমে একটি জীবন বাঁচানো নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। নিয়মিত রক্তদান একটি ভাল অভ্যাস। রক্তদান করা কোন দুঃসাহসিক বা অসম্ভব কাজ নয় বরং তার জন্য একটি সুন্দর মন থাকা চাই। রক্তদান আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও বটে। এটা সম্পূর্ণ মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রম। রক্তদান সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং আসুন আমরা প্রত্যেকে সুনাগরিকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদানে নিজে এগিয়ে আসি এবং আমার চারপাশের সবাইকে এই মহৎ কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে রক্তের বন্ধনে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় একজন রক্তযোদ্ধা হই এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ নোবেল বিজয়ী মাদার তেরেসার কথা সুর মিলিয়ে বলি 'এক ব্যাগ রক্ত শুধু এক ব্যাগ রক্ত নয়, একটি জীবন'।

তথ্য সূত্র:

- রক্তদানের ইতিহাস-বিদেশী ওয়েবসাইট অবলম্বনে।
- সন্ধানী।
- বাঁধন-স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন।
- কোয়ান্টাম মেথড।
- লায়ন্স ক্লাবস বাংলাদেশ, লায়ন্স ফাউন্ডেশন।
- ইসলামি ব্যাংক হাসপাতাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টার, মিরপুর।
- বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত পত্রিকার ই-পেপার।
- গুগল ও উইকিপিডিয়া।

সুখী কে?

মেজর মোঃ ইউসুফ শরীফ, সিগন্যালস্
কর্ড টু চিফ
পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

হৃদয় যার শান্ত, তাঁর কিসের সুখের ভয়?
হরন করলে পরের সুখ, হয় জয়ের পরাজয়,
ভাবো যদি নিয়ম দিয়ে, করবে কারো হিত
করতে পারো, তাতে কারো, হতে পারে বিপরীত।

বিশ্বাস যদি করো তবে বিশ্বাসী হও দিলে
নইলে ক্ষতি গুনতে হবে সদা তিলে তিলে।
আজকে যারে ক্ষমতা বলো, কাল তা তোমার দায়
মূর্খ পেঁচারা যাবে দুরে সরে, তুমি রবে অসহায়।

জীবনদানে শ্রষ্টা তোমায়, দিয়েছেন মহা ক্ষমতা
তাঁর তরে দাও ঢেলে মন প্রাণ ভালবাসা সিক্ত মমতা
ভালোবেসে মানুষেরে বহাও আলোর বন্যা
হবেই হবে জয় তোমার, রবে তুমি অনন্যা।

তিলকে কখনো তাল করো না, তালকে রেখো ঠিক
তবেই দেখো জয়ী রবে তুমি, রাঙ্গাবে দিগ্বীদিক।
আধার ঘরের মানিক হয়ে, ছড়াবে আলোক শিখা
তোমার পথে চলবে সবে খুজে নিয়ে তব রেখা।

অন্যের ঘরে আলোক জ্বালাবে বাঁচাবো পরের স্বপ্ন
মঙ্গল আলোকে সাজাতে ভুবন হৃদয় রেখো মগ্ন।
সুখের লাগিয়া নয় এ জীবন, সুখ ছড়াতে চাই
সবার জীবনে সুখ ছড়িয়ে, মরনেও ব্যথা নাই।

Technical Education in Bangladesh: An Avenue to be benefited from Demographic Dividend

Maj Md Sabir Ahmed, psc (R)
Deputy Registrar (Academic Section)

Introduction

An opportunity arises in a country when the working population (15-64 years) exceeds the dependent population (below 14 years and above 65 years) which can be used to improve the social and economic condition of the country. This opportunity is called the demographic dividend. Economists denote that demographic dividend has four special benefits such as improvement in labor supply, growth of savings, human capital, and domestic market expansion. These benefits can be ensured if this working youth can be utilized properly.

Background

In the 1970s, the population growth rate of Bangladesh was much higher. But over the last few decades, the country has been experiencing a decline in population growth. At present, the rate of population growth is 1.37% and the number of working people in our country is about 68% of the total population whose age is 15 to 59 years . Now, Bangladesh has more working people than dependent people. So, it is high time to boost the economy of our country by engaging this working population in productive socio-economic activities to be benefited from the demographic dividend. For example, China, South Korea, Vietnam, Taiwan, and Thailand have taken their economic position to new heights through the effective use of the demographic dividend.

Present Senario

Individuals, governments, entrepreneurs, and private organizations, all have to work together for reaping the full benefits of the demographic dividend. It is important to keep accurate statistics of how many people are entering the labor market of the country every year and to evaluate the qualifications of each person in the labor market, whether entrepreneurs are being created in the country, and whether employment is going to be created around the world. At present, our manpower is being exported to more than 130 countries. The manpower export of Bangladesh was 6.93 lakh in the 2018-19 financial year and according to BMET, Bangladeshi migrants remitted the country about 232 billion US dollars from around the world between 1976 and 2020 . But it is true that the rate of semi-skilled and unskilled population is higher among the manpower going abroad. The demand for skilled and qualified manpower is increasing which can be beneficial in achieving high remittances and enhancing the image of the country. So, it is very essential to build quality and skilled human resources by providing proper and up-to-date education and training based on science and technology.

Technical Education

Technical education is essential for the development of skilled human resources which is a supporting force for socio-economic progress. But the development of technical education in Bangladesh is not satisfactory yet. There are 49 government and about 400 private polytechnic institutes, 4 survey institutes 33 textile institutes, and 64 technical schools and colleges (for SSC and HSC level education) in Bangladesh . But this number is very insignificant compared to general educational institutions and the quality of these institutions is also questionable. Though various polytechnic institutions are introducing modern and updated subjects, most of them do not have adequate teachers to teach these courses. Teaching activities according to the newly adopted syllabus are also hampered due to the limited training facilities for the teachers. The shortage of adequate laboratories and necessary equipment for practical classes is also a major obstacle to the expansion of technical education. Moreover, it is true that most of the students of technical education come from poor village families and the dropout rate is very high among them due to financial difficulties. And the notion that prevails in our society is that technical education is only for neglected and backward students. Such social prejudices are the major obstacles to the development of technical education in our country.

Emphasis by Government

Hopefully, the interest of students and guardians is increasing day by day in technical education. The government is now emphasizing this skill-based career-oriented education. To expand technical education in Bangladesh, there is a plan to increase the number of students in technical education to 30% of the total students in the country by 2030 . The government also plans to set up the required number of technical educational institutions in the country to implement this goal. In order to implement this goal, there is no alternative to the infrastructural development and the introduction of up-to-date technology and subjects in the polytechnic institutes according to the demand of the ever-changing societies around the world. For attracting talented students to different levels of technical education, it is essential to create more opportunities for higher education for technical certificate holders and it is also important to take necessary steps for increasing the self-employment opportunities of polytechnic graduates. Creating employment abroad for them is important because comparatively more remittances can be earned if skilled manpower in technical education can be sent abroad rather than unskilled manpower.

Conclusion

Technical education can play an important role in creating capable competitors in a competitive market. This system is effective and up-to-date in addition to the equivalent general education. And this is why the countries developed in education give especial importance to technical education. To make Bangladesh a developed country, it is necessary to enhance the innovative capabilities of future generations by ensuring the best use of science and technology. In this connection, improving the quality of technical education is essential to make the people a tool of development by turning the large population of the country into skilled human resources. In conclusion, it can be denoted that technical education has a great significance in building a developed country through the effective contribution of skilled and capable manpower by reaping the maximum benefit from the demographic dividend.

Bangladesh Economic Review-2020
World Population Prospects-2020
Bangladesh Economic Review 2020
Daily Ittefaq, 26 January 2021
BANBEIS, Ministry of Education, cited in Bangladesh Economic Review-2020
Daily Prothom-alo, 04 October 2019.